# ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা

# ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা

( কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের 'অধর মুখার্জি' লেক্চর )

[ কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয় লিখিত ভূমিকা সহ ]


**শ্রীক্ষিতিমোহন সেন,**

অধ্যাপক, বিদ্যাভবন, বিশ্বভারতী


কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে

প্রকাশিত

১৯৩০

# নিবেদন

ভারতীয় মধ্যযুগের ধর্ম্মসাধনার ইতিহাস-কথা বলিতে যে কোনো বিদ্বজ্জনসভার আহ্বান আসিবে তাহা কখনো মনে করি নাই। সে আজ পঁয়ত্রিশ বৎসরের কথা যখন বাল্যকালে কাশীতে নানা সম্প্রদায়ের সাধুসন্তদের সহিত পরিচয় ঘটিল। তাঁহাদের সবারি প্রিয়ধাম কাশীতেই সৌভাগ্যক্রমে আমার জন্ম। তাই হয়ত এই দিকে কিছু কিছু সুযোগ ঘটিয়া গিয়াছিল। সেই সব পুরাতন সাধকগণের সাধনা ও বাণী এমন উদার গভীর ও মনোহর যে অল্পবয়সেই তাহাতে আমার নেশা লাগিয়া গেল। ইহার পর লেখা পড়ার সময়েও এই সব বাণীর পরিচয়েই আমার অধিকাংশ সময় কাটিত। সৌভাগ্যক্রমে তখন এমন সব পথপ্রদর্শকের প্রসাদ লাভ করিলাম যাঁহাদের মত লোক এখন পাওয়া দুর্ল্লভ। সেই শ্রেণীর লোক দিন দিন কমিয়া আসিতেছেন। এই সে দিন বোম্বাই নগরে শান্তাক্রুসে কাঠিয়াওয়াড় ভাবনগরের লাখনকা গ্রামবাসী বৃদ্ধ সাধু বাবা মোহনদাস পরলোক গমন করিলেন। তাঁর কণ্ঠে তিন হাজারের অধিক ভজন ছিল। বাণী যে কত হাজার তাঁর মুখে মুখে ছিল তাহা বলা যায় না। মৎসম্পাদিত 'কবীরে'র প্রথম খণ্ডে আমি এরূপ কয়েকজন সাধুর নাম করিয়াছি। এমন কত কত "সমর্থ" সাধক বিদ্বৎসমাজে খ্যাত না হইয়াই চলিয়া গেলেন।

ভারতের নানা স্থানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মঠে মঠে ও সম্প্রদায়ের সংগৃহীত গ্রন্থেও সাধকদের বহু বাণী সংগৃহীত আছে। তাহাও ক্রমে নষ্ট ও দুষ্প্রাপ্য হইয়া আসিতেছে। অনেক মঠে মঠস্বামীরা সেই সব বাণীর সংগ্রহ যক্ষের ধনের মত গোপন করিয়া রাখেন, মাথা খুঁড়িয়া মরিলেও সে সব দেখিতে পাইবার জো নাই। রাজপুতানার রাজাদের গ্রন্থালয়েও এই একই অবস্থা। অনেক দুঃখে এই সব কথা লিখিতেছি।

সেই যুগের সাধকেরা অনেকেই অতি নিম্নকুলসম্ভূত কিন্তু তাঁহাদের অনুবর্ত্তী সম্প্রদায়গুলি তাঁহাদিগকে অনেক সময় নানা উপায়ে উচ্চজাতীয় বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। সেইজন্য তাঁহারা সেই সব সাধকদের অনেক বাণী চাপিয়া গিয়াছেন ও অনেক কথা বিকৃত করিয়া বলিতে বাধ্য হইয়াছেন। কবীর, দাদূ প্রভৃতি সাধকেরা কোন বংশে জন্মগ্রহণ করেন তাহা অনুসন্ধান করিলেই এই কথাটি ভাল করিয়া বুঝা যাইবে। কবীর ছিলেন মুসলমান জোলা—সেই কথা কত গল্প দিয়াই আচ্ছাদন করা হইয়াছে।

এখন ইতিহাস আলোচনায় সবই ধরা পড়িয়াছে। তিনি যে মুসলমান জোলার ঘরে জন্মগ্রহণ করেন তাতে আর কোনো সংশয়ই নাই। তাঁর দীক্ষাও রামানন্দ হইতে হঠাৎ প্রাপ্ত নহে। রামানন্দের এমন শিষ্য আরও যে অনেক আছেন। এই সব কথা এই গ্রন্থের ৬৪-৬৫ পৃষ্ঠায় লেখা হইয়াছে।

দাদূ-সম্প্রদায়ীরা সত্য কথা চাপা দিয়া বলিতে চান, দাদূ নাগর ব্রাহ্মণের সন্তান। কেহ কেহ বলেন তাঁর জন্মই নাই, তিনি যে নিরঞ্জন। কিন্তু সত্য তো আর চাপা দেওয়া যায় না।

তাই নানাপ্রকার মত রহিয়া গেল। স্বর্গীয় সুধাকর দ্বিবেদী মহাশয় বলেন, দাদূ যাঁদের ঘরে জন্মান তাঁরা চামড়ার "মোট" বা কূপ হইতে জল তুলিবার পাত্র সেলাই করিতেন কাজেই তিনি মুচী। এই কথাটিও আংশিক সত্য।

এখন ধরা পড়িয়া গিয়াছে যে তাঁর জন্ম মুসলমান ধুনকর বংশে ( দ্রঃ ৭৭-৭৮ পৃঃ )। বালগোপাল কৃত "জীবন-পরিচয়" গ্রন্থে, তেজানন্দ কৃত গ্রন্থে, দাসজী কৃত "পংথ-প্রথ্যা" গ্রন্থে সব কথা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। আমি একলা একথা বলিতে হয়তো একটু ইতস্ততঃ করিতাম, কিন্তু দাদূ-তত্ত্বানুরাগী সত্যনিষ্ঠ শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রসাদ ত্রিপাঠীও একথা স্পষ্ট লিখিয়াছেন। যে সব মঠের গ্রন্থ দেখিয়া তিনি এই তত্ত্ব প্রচার করেন সে সব মঠের অধিকারীরা এই জন্য রাগ করিয়া তাঁদের মঠের অমূল্য সব প্রাচীন গ্রন্থ পোড়াইতে আরম্ভ করিয়াছেন।

এসব বিষয়ে অনেকটা সাচ্চা খবর পাওয়া যায় সে সব সাধুর কাছে যাঁরা হৃদয়ের অনুরাগে সাধক হইয়াছেন কিন্তু কোনো সম্প্রদায়ের বন্ধনে ধরা দেন নাই। সম্প্রদায়ী সাধুরা এই সব গভীর জ্ঞানী সাধুদিগকে সম্প্রদায়হীন বলিয়া আমল দিতে চাহেন না। কিন্তু যদি পুরাতন সব সাচ্চা খবর পাইতে হয় আর গভীরতম বাণীর সংগ্রহ পাইতে হয় তবে তাহা মিলিবে এই সব সাধুদেরই কাছে।

একটা কথা এখানে বলা উচিত মধ্যযুগের সাধকদের যে সব বাণী অতি গভীর ও উদার সে সব বাণী অনেক সময় তাঁদের সম্প্রদায়ের সংগ্রহে তেমন মেলে না। অনেক সময়েই তাহা মেলে এই সব অসম্প্রদায়িক সাধুদের কাছে।

দেশ কালের অবস্থানুসারে এই সব সাধুর সংখ্যা এখন বিরল হইয়া আসিয়াছে। যে সব সাধু এখনকার বাজারে রীতিমত ভাল ব্যবসা চালাইতে পারেন সে সব সাধু ইঁহারা ন'ন। কাজেই এখনকার নূতন যুগের চাহিদা অনুযায়ী নূতন নূতন নানারকমের "স্বামী"দের উদ্ভব হইতে থাকিলেও এই সব পুরাতন সাধুদের ধারা এখন নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে। আর কিছুকাল পরে ইঁহাদের স্মৃতিমাত্র অবশেষ থাকিবে, অথবা হয়ত স্মৃতিও থাকিবে না কারণ ইঁহাদের সম্বন্ধে সকলে এতই কম খবর রাখেন।

অথচ যদি ভারতের মধ্যযুগের সাধনার প্রকৃত ইতিহাস জানিতে হয় তবে এই সব সাধুদের কাছে মধ্যযুগের সাধনার বাণী তত্ত্ব ও ইতিহাস সংগ্রহ না করিলে আর কোনো গতি নাই।

ভারতের সবচেয়ে বড় কথা তার ধর্ম্ম। নানা ভেদ-বিভেদের ভূমি ভারতের প্রধান কথা এই যোগ সাধনার চেষ্টা। যুগে যুগে বড় বড় সাধকদের মধ্য দিয়া সেই চেষ্টাই চলিয়া আসিতেছে। ভারতের সমস্যাই তো তাই। রাষ্ট্রীয় সাধনা তার প্রধান কথা নয়। কাজেই এই সব সাধুদের সংগৃহীত ও নানা মঠের গ্রন্থে সংরক্ষিত বাণী ও ধর্ম্মতত্ত্ব প্রভৃতি আলোচনা না করিলে ভারতের প্রকৃত মর্ম্মস্থানটির খবর পাইবার কোনো উপায় নাই।

আমাদের দেশ যদি য়ুরোপ বা আমেরিকা হইত তবে দেখিতাম এই সব সন্ধান জানিবার জন্য বহু যুবক তাঁদের প্রাণ-পাত করিতেছেন। দেশের যথেষ্ট সংখ্যক প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া এই সব অনুসন্ধানের তপস্যা চলিয়াছে। কিন্তু আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় এমন আশা দুরাশা মাত্র!

১৯০৮ সালে শান্তিনিকেতনে আসিয়াও আমি আমার প্রত্যেকটি ছুটী ও সর্ব্বপ্রকারের অবসরকাল এই সব সন্ধানেই কাটাইয়াছি। দীর্ঘকাল আমার এই বাতিকের খবর সেখানে মুখ খুলিয়া কাহাকেও জানাই নাই। দীর্ঘকাল এমন ভাবে কাটিল। তারপর কি জানি কেমন করিয়া কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ সন্ধান পাইলেন। তখন তিনি ক্রমাগত আমাকে এই সব বিষয়ে লিখিবার জন্য তাগিদ দিতে লাগিলেন।

প্রথমতঃ সকলের কাছে এই সব বিষয় জানাইতে আমার খুব সঙ্কোচ ছিল। তারপর ইহাও জানিতাম, যে গ্রন্থপ্রকাশক আমার এই কাজে হাত দিবেন তাঁহাকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হইবে। তবু ইণ্ডিয়ান প্রেস রাজী হইলেন, আর কবিবরের অসহনীয় তাগিদে কবীরের কয়খণ্ড প্রকাশ করিতে হইল। কবীরের মুখ্য বাণীর মাত্র চারিটি খণ্ড প্রকাশ হইয়াছিল। এই রকম দশটি খণ্ড বাহির হইলে কবীরের কতকটা পরিচয় দেওয়া যাইত। মধ্য-যুগের এমন প্রায় দুইশত জন সাধকের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে যাঁদের বাণী মানব-সাধনার পথে নানাভাবে সহায়তা করিবে। ক্ষেত্র বিরাট্; কিন্তু কাজ করিবার লোক কৈ? এই সব দিকে কয়জন লোকের অনুরাগ আছে?

এই সব বিষয়ে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের কাছে অশেষ উৎসাহ ও সহায়তা পাইয়াছি। কোনো বিদ্যায়তনে এই অনুসন্ধানের কোনো স্থান কখনো হইতে পারে তাহা মনেও করি নাই। অন্য কাজ করিয়া অবসর সময়ই এই কাজে দিতাম। তিনি বিশ্বভারতীতে এই কাজের অবসরও রচনা করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু ভবিষ্যৎকালকে যাঁহারা সৃষ্টি করিবেন সেই সব তরুণ

কর্ম্মীদের এখনো তেমন করিয়া এই ক্ষেত্রে দেখা পাওয়া গেল না। উপাধি লাভের উদ্দেশ্যে বা thesis লেখার জন্য এই বিষয়ে দুই একজন এক আধটুকু সানুগ্রহ সন্ধান করেন মাত্র। কিন্তু সেরূপ ভাবে কাজ করিয়া আর বিশেষ কি লাভের আশা করা যায়?

সত্যকার বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া তোলা যাঁর জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল সেই মনীষী জ্ঞান-তপস্বী আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই সব বিষয়ে আলাপ করার জন্য স্বয়ং ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এই সূত্রে তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয় ও এবিষয়ে কোনো একটা ব্যবস্থা (scheme) করা যায় কি না তাহা নানাভাবে আলোচনা করেন। অনেক কিছু করার তাঁর ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তাঁর অকাল-মৃত্যুতে সে সবই অপরিপূর্ণ রহিয়া গেল।

গত বৎসর যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে "অধর মুখোপাধ্যায় বৃত্তি" সূত্রে আমাকে কিছু বলিতে বলা হইল তখন এরূপ কিছু আমি আশাও করি নাই, কারণ এত বড় পণ্ডিত সমাজের যে আবার এই সব নিরক্ষর সাধকদের সাধনার প্রতি এই মনোযোগ হইবে একথা মনেও করি নাই। জানি না কাঁহার বা কাঁহাদের উদ্যোগে ইহা সম্ভবপর হইল। কাজেই আমি সমগ্র কলিকাতাবিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষকেই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। বিষয়টি বিশাল। সামান্য দুই একটি বক্তৃতায় তাহার কতটুকু পরিচয়ই বা দেওয়া সম্ভব। আমাদেরও কর্ম্মশক্তি ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিবে; এখন কেবল আশা করিয়া আছি যে ভবিষ্যতের যাঁরা আশাস্থল

তাঁহারা আমাদের স্কন্ধ হইতে কবে এই সব গুরুভার নিজেদের যোগ্যতর স্কন্ধে গ্রহণ করিবেন।

এই সব ক্ষেত্রে যাঁহারা নাবিবেন তাঁহাদের জ্ঞানতপস্যা ব্যর্থ হইবে না। এই কাজে নাবিলে তাঁহারা দেখিবেন যে ধর্ম্ম-জগতে এমন কোনো "পরীক্ষা" (experiment) সম্ভবপর নয় যাহা ভারতের মধ্যযুগে কোনো না কোনো সাধক সাধনা করিয়া যান নাই। এই সব সাধকরা শাস্ত্রজ্ঞানহীন, কাজেই কোনো বাঁধা পথে তাঁহারা চালিত হন নাই। তাঁদের প্রতিভা ও তাঁদের দৃষ্টি সদাই উন্মুক্ত ছিল। শাস্ত্র-শাসিত ধর্ম্মসম্প্রদায়গুলি সবই প্রায় গতানুগতিক ভাবে বাঁধা রাস্তায় চলিয়া আসিয়াছে কিন্তু ইঁহাদের প্রত্যেকের নূতন দৃষ্টি নূতন ভাবনা নূতন পথ। এইপথে মানব-মনের ভাল মন্দ নানা ভাবে পরখ করিবার সাহসের পরিচয় মিলিবে। নানা দিক্ দিয়া ধর্ম্মভাবকে সার্থক করিবার চেষ্টা দেখা যাইবে। মানবতত্ত্বের এত বড় একটি আলোচনার ক্ষেত্র যে বৃথা পড়িয়া রহিল তাহাতে রামপ্রসাদের এই কথাটি মনে হয়—

> "মনরে কৃষিকাজ জান না।
> এমন মানবজমীন রইল পতিত,
> আবাদ কল্লে ফলতো সোনা।"

শাস্ত্র-শৃঙ্খলিত ও গ্রন্থ-বদ্ধ আমরা ভাল করিয়া চাহিয়াও দেখিলাম না যে চক্ষের সম্মুখে কত বড় একটি সুযোগ বৃথা চলিয়া গেল। এখনো যদি প্রাণপণ চেষ্টা করা যায় তবু সেই বিরাট্ ঐশ্বর্য্যের অতি সামান্য অংশ মাত্র উদ্ধার করা সম্ভব হইবে। আমরা হয়তো সেই ঐশ্বর্য্যের মাত্র এক আনা অংশের

খবর পাইয়াছি আর পনর আনা অংশ ইতিপূর্ব্বেই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আর যতটুকু আছে তাহাও লুপ্ত হইতে আর বেশী বাকী নাই।

যাঁহারা আলোচনা করিবেন তাঁহারা দেখিতে পাইবেন লিখিত সব শাস্ত্র ও গ্রন্থ অপেক্ষা এই সব নিরক্ষর সাধকদের এক একটি বাণী কত মহান্ কত গভীর। ইঁহাদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান বা সম্প্রদায়গত কোনো ভেদ-বুদ্ধি নাই। ইঁহারা অধিকাংশই নিরক্ষর এবং সকল সাধনার মৈত্রী ও যোগই ইঁহাদের আপন সাধনার ধন। সেই যোগ সাধনাই ভারতের সাধনা, বাহিরে ইহার যত প্রতিকূল লক্ষণই দেখা যাক না কেন।

এইখানে যে অবসরটুকু পাইয়াছিলাম তাহাতে কোনো মতে সেই যুগের সাধনার একটু আভাস মাত্র দিতে পারিয়াছি। এখানে কোনো মতে "কাঠাম"খানা মাত্র দেখান গিয়াছে। সম্ভব হইলে ভবিষ্যতে সেই যুগকে আর একটু পূর্ণতর ভাবে দেখাইতে চেষ্টা করিব। জীবন্ত একটি যুগের কেবল কঙ্কাল মাত্র দেখাইয়া বিশেষ কিছু বুঝান যায় না। তার উপর একটু রক্তমাংস না থাকিলে জীবনের রূপটি বুঝিতে পারা কঠিন হয়। তখনকার সাধকদের সাধনা ও বাণীর একটু পরিচয় দিতে পারিলে সেই যুগের রূপটি প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতে পারে।

এই বিশাল কার্য্যক্ষেত্রের জন্য ভবিষ্যতে অনেক সাধক চাই। তাই দেশের তরুণ জ্ঞানার্থীদের সাধনা এই ক্ষেত্রে আহ্বান করিতেছি। যাঁহাদের অনুগ্রহে এই কয়টি কথাও জানাইবার অবসর পাইলাম সেই বিশ্ববিদ্যালয়-কর্ত্তৃপক্ষকে এবং পরলোকগত

আচার্য্যপ্রবর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উদ্দেশে আমার ধন্যবাদ জানাইতেছি।

স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ মনোমোহন ঘোষ আমার প্রুফশীট্ প্রভৃতি দেখা হইতে আরম্ভ করিয়া আমাকে নানা ভাবে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাকে আমার ধন্যবাদ জানাইতেছি। এই কার্য্যে আমি কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কাছে যে কি পরিমানে ঋণী তাহা বলিয়া বুঝাইতে পারি না। সেই যুগের সাধকদের গম্ভীর বাণীর রসসম্ভোগে রসানুভব-নিপুণ তাঁহার যে সশ্রদ্ধ প্রতিভা দেখিয়াছি এমন আর কাহারও দেখি নাই। সেই সব বাণীর প্রতি তাঁহার অনুরাগ ও উৎসাহই এতকাল আমার মহা-সহায় হইয়া আসিয়াছে। তাঁহারই লিখিত একটি ভূমিকা এই মুদ্রিত বক্তৃতা-প্রারম্ভে আশীর্ব্বাদের মত সন্নিবিষ্ট হইল।

আর যাঁহারা যে ভাবে এই ক্ষেত্রে আমাকে যতটুকু সহায়তা করিয়াছেন সকলের কাছেই আমার সকৃতজ্ঞ অভিবাদন জানাইয়া আমার নিবেদনটি সমাপ্ত করিতেছি।

শান্তিনিকেতন,<br>
পৌষ-পূর্ণিমা, ১৩২৬ সাল।

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

# ভূমিকা

ভারতবর্ষের যে সব ইতিহাস আমরা পড়ি সে তা'র বাইরের ইতিহাস। সেই ইতিহাসে বিদেশীর অংশই বেশি। তা'রা রাজ্যশাসন ক'রেছে, যুদ্ধ বিগ্রহ ক'রেছে, আমরা সেই বাইরের চাপ স্বীকার ক'রে নিয়েছি,—মাঝে মাঝে মাথা নাড়া দিয়ে সেটা ঠেলে ফেল্‌বার চেষ্টা ক'রেছি, মাঝে মাঝে চেষ্টা সফল হ'য়েছে। মোটের উপর এই ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের অকৃতার্থতাই অধ্যায়ের পর অধ্যায়ে আমাদের চোখে পড়্‌তে থাকে।

এ কথা মান্‌তে হবে যে রাষ্ট্রিক সাধনা ভারতের সাধনা নয়। একদা বড়ো বড়ো রাজা ও সম্রাট্ আমাদের দেশে দেখা দিয়েছেন, কিন্তু তাঁদের মহিমা তাঁদের মধ্যেই স্বতন্ত্র। দেশের সর্ব্বসাধারণ সেই মহিমাকে সৃষ্টি, বহন বা ভোগ করে না। ব্যক্তিবিশেষের শক্তির মধ্যেই তা'র উদ্ভব এবং বিলয়।

কিন্তু ভারতের একটি স্বকীয় সাধনা আছে; সেইটি তা'র অন্তরের জিনিষ। সকল প্রকার রাষ্ট্রিক দশা-বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়ে তা'র ধারা প্রবাহিত হ'য়েছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই ধারা শাস্ত্রীয় সম্মতির তটবন্ধনের দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়, এর মধ্যে পাণ্ডিত্যের প্রভাব যদি থাকে তো সে অতি অল্প। বস্তুত এই সাধনা অনেকটা পরিমাণে অশাস্ত্রীয়, এবং সমাজশাসনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। এর উৎস জনসাধারণের অন্তরতম হৃদয়ের মধ্যে, তা সহজে উৎসারিত হয়েছে, বিধিনিষেধের পাথরের বাধা ভেদ ক'রে। যাঁদের চিত্তক্ষেত্রে এই প্রস্রবণের প্রকাশ,

তাঁরা প্রায় সকলেই সামান্য শ্রেণীর লোক, তাঁরা যা পেয়েছেন ও প্রকাশ ক'রেছেন তা " ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন "।

ভারতের এই আন্তরিক সাধনার ধারাবাহিক রূপ যদি আমরা স্পষ্ট ক'রে দেখ্‌তে পেতুম তাহলে ভারতের প্রাণবান্ ইতিহাস যে কোন্‌খানে তা আমাদের গোচর হতে পার্‌ত। তাহলে জানা যেত ভারতবর্ষ যুগে যুগে কি লক্ষ্য ক'রে চ'লেছে, এবং সেই লক্ষ্যসাধনে কি পরিমাণে তা'র সিদ্ধি। সুহৃদ্বর ক্ষিতি-মোহন সেন তাঁর এই গ্রন্থে ভারতবর্ষের সুদীর্ঘকালের সেই চিত্তপ্রবাহের পথটিকে তা'র ভিন্ন ভিন্ন শাখায় প্রশাখায় অনুসরণ ক'রে এসেছেন। আমরা দেখ্‌তে পেয়েছি এই প্রবাহটি গভীর রূপে সত্য এবং একান্তভাবে ভারতবর্ষের স্বকীয়। ভারতের জনসাধারণের মধ্যে সাধনার যে স্বাভাবিক শক্তি অন্তর্নিহিত র'য়েছে ক্ষিতিমোহনের এই রচনায় তাকে আবিষ্কার করা গেল। এই প্রকাশের অভিব্যক্তির যে ধারা অন্তর-বাহিরের বাধার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হ'য়েছে এই গ্রন্থের সীমারেখায় তা'র একটা রূপচিত্র অঙ্কিত হ'য়েছে। এখন তা'র উদ্ভাবনের তা'র প্রাগ্রসর যাত্রার সম্পূর্ণ একটি ইতিহাস পাবার অপেক্ষা র'য়ে গেল, না পেলে ভারতবর্ষের ধ্রুব স্বরূপটির পরিচয় ভারতবর্ষের লোকের কাছে অসম্পূর্ণ, এমন কি ভ্রমসঙ্কুল হ'য়ে থেকে যাবে।

শান্তিনিকেতন,<br>১২ই পৌষ, ১৩৩৬ সাল। } শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

# ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা

( প্রথম বক্তৃতা )

ভারতে আর্য্য ও আর্য্য-পূর্ব্ব সভ্যতা

আর্য্যেরা যখন আসিলেন তখন ভারতবর্ষ দ্রবিড় ও প্রাচীনতর নানাবিধ সভ্যতার সমৃদ্ধিতে সুসম্পন্ন। সে সব সভ্যতার মধ্যে ধর্ম্ম-কর্ম্ম, সামাজিক বিধিব্যবস্থা সবই ছিল। আর্য্যেরাও আবার নিজেদের ধর্ম্ম-কর্ম্ম, সমাজ-ব্যবস্থা লইয়া আসিলেন। বহু শতাব্দীর ঘাত-প্রতিঘাত-সংঘাতে ভারতে আর্য্য ও আর্য্য-পূর্ব্ব নানাবিধ সভ্যতা মিলিয়া একটি বিরাট্ ভারতীয় সভ্যতা গড়িয়া উঠিতে লাগিল। তখন সকলের মধ্যে প্রাণ-শক্তি ছিল বলিয়া এই নূতন সৃষ্টিটি গড়িয়া ওঠা সম্ভবপর হইয়াছিল।

নানাজাতি গৃহীত

এই গঠনকার্য্য যখন চলিতেছে তখনও বাহির হইতে ভারতে নানা জাতির আগমন চলিয়াছে; মহাভারতে ও পুরাণে এমন কত জাতির নামই পাওয়া যায়। যখন শক, হূণ প্রভৃতি জাতি এদেশে আসিল তখন এদেশের সমাজে জীবন ছিল, তাই দেখিতে পাই তাহারা ক্রমে বিরাট্ ভারত সমাজেরই অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেল। শক, হূণ প্রভৃতি জাতিরা বিভিন্ন সভ্যতা আনিলেও বিরুদ্ধ সভ্যতা আনে নাই, আর ভারত সমাজেও গ্রহণ করার মত শক্তি আছে বলিয়া দু'এক পুরুষ যাইতে না যাইতেই সেই সব জাতিরা ভারতীয় ধর্ম্মে, ভাবে ও চিন্তায় ভরপূর হইয়া উঠিল।

উপনিষদের অধ্যাত্মবাদ

বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড যে ক্রমে উপনিষদের অধ্যাত্মবাদের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল এবং চিন্তাশীল ভাবুকেরা যে নিগূঢ় মর্ম্মবাদী (mystic) হইয়া উঠিতে লাগিলেন তাহার মূলে হয়ত তখনও এইরূপ বাহিরের নানাবিধ বিচিত্র সভ্যতা ও চিন্তার আঘাত। উপনিষদে যাহা চিন্তায় আবদ্ধ ছিল ক্রমে তাহা জীবনে ও সাধনায় পরিণত হইতে আরম্ভ করিল। মহাবীর, বুদ্ধ প্রভৃতি অনেক চিন্তাশীল সাধক এই ধারাকে অগ্রসর করিয়া দিয়া গেলেন।

শক্তি জাগ্রত

তখনও ভারতে শক্তির ও জীবনের লীলা নানা ক্ষেত্রে বিচিত্রভাবে আপনাকে প্রকাশ করিতেছে। ধর্ম্মমতে, ধর্ম্মসাধনায়, ধর্ম্মসমাজে, সমাজ-ব্যবস্থায়, রাজ্য ও সাম্রাজ্য-ব্যবস্থায়, শিল্পে, সাহিত্যে সর্ব্বত্র ভারত তখন জীবন্ত। ক্রমে ভারত এই প্রচণ্ড শক্তি হারাইতে লাগিল; তার ধর্ম্ম, তার সমাজ-ব্যবস্থা তার চিন্তা, দৃষ্টি, চেষ্টা, রাজ্যনীতি সবই ক্ষুদ্র ও সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিল। ইহাই হইল মধ্যযুগ।

শক্তি ক্ষীণ

মধ্যযুগ

মুসলমান আগমনের প্রতিঘাতে জাগরণ

মুসলমান-সাধনা ও মুসলমান-শক্তির আবির্ভাবে এই যুগ আবার ভক্তি ও প্রেমে ভরপূর হইয়া উঠিল। নানা অন্ধতায়, ধর্ম্মের আচারের জটিলতায়, ভক্তিভাবের অতি সরসতায় যে সহজ প্রেম ও ভক্তি চাপা পড়িয়া গিয়াছিল তাহা এই আঘাত পাইয়া ও মুসলমান-সাধনার একেশ্বরবাদ ও দৃঢ় নিষ্ঠায় নূতন করিয়া জাগ্রত হইয়া উঠিল; নহিলে ভক্তিবাদ এদেশে নূতন নহে। বেদে বশিষ্ঠাদির মন্ত্রে, বরুণ প্রভৃতি দেবতার স্তবে ভক্তির ভাব

দেখিতে পাওয়া যায়। তবে, আর্য্যেরা একদিকে ভক্তি অপেক্ষা যাগযজ্ঞ-ক্রিয়াতেই বা অন্যদিকে বিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞানে বেশী অনুরক্ত ছিলেন। আর্য্যদের পূর্ব্ববর্ত্তী দ্রবিড় প্রভৃতি জাতির মধ্যে ভক্তির ভাব ছিল বেশি। আর্য্যদের জ্ঞানের সহিত এই ভক্তিবাদ মিশিয়া ভারতে ধর্ম্মভাব গভীর ও উদার হইয়া উঠিতে লাগিল।

কর্ম্মকাণ্ডের প্রতিঘাত

উপনিষদের যুগের প্রাক্‌কালে যাগযজ্ঞ ও কর্ম্মকাণ্ডের বিরুদ্ধতার আঘাতে আর্য্যদের হৃদয়ে গভীর অধ্যাত্মভাব (mysticism) জাগ্রত হইতে ছিল। সেই ভাবের সহিত ভক্তি ও প্রেমভাব মিলিয়া লোক-চিত্তকে প্রভাবান্বিত করিতে লাগিল। তারপর যখন বৌদ্ধদের বিশুদ্ধ জ্ঞান ভারতে প্রচারিত হইল তাহারও প্রতিঘাতে এই ভাব ক্রমে লোক-চিত্তে গভীর হইতে লাগিল। ক্রমে বৌদ্ধদের মধ্যেও প্রেমভক্তির বিস্তর প্রভাব ঘটিল।

প্রতীক পূজার প্রতিঘাত

দক্ষিণ দেশে গ্রাম্য দেবদেবী, লিঙ্গপ্রতিমা-পূজা প্রভৃতির প্রতিঘাতেও সরল চিত্তে এই প্রেম ও ভক্তি ক্রমে প্রবল হইতে লাগিল। শৈব ও বৈষ্ণব ভক্তদের ভক্তিই তার প্রমাণ। তাঁরা মুখে শিব ও বিষ্ণুর নাম করিলেও চিন্তায়, বাক্যে ক্রমাগতই ভক্তির সর্ব্ববিধ বাধা অতিক্রম করিতেছিলেন।

শক্তি সংহত—ঐক্যে

মুসলমানেরা যখন আসিলেন তখন দেশের নানাবিধ দুর্ব্বলতার সঙ্গে সঙ্গে এই ভক্তি প্রেম ও অধ্যাত্ম-দৃষ্টি দুর্ব্বল হইয়া আসিতেছিল ; মুসলমান-আক্রমণ ও সাধনার প্রতিঘাতে আবার সেই ভাব জাগিয়া উঠিতে লাগিল—এই কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সংখ্যার বাহুল্যে

বা পরিমাণের বিশালতায় যে যথার্থ শক্তি নাই তাহা ইতিহাস বার বার প্রমাণ করিয়াছে। তাই তখনকার ভারতের ইতিহাসে দেখা গেল ঐক্যের আদর্শের অভাবে অসামান্য বীরত্বসম্পন্ন হইয়াও অসংহত হিন্দুসমাজ সংহত জীবন্ত অল্প-সংখ্যক মানুষের প্রচণ্ড শক্তির কাছে দীর্ঘকাল দাঁড়াইতে পারিল না। তবু একথা সত্য য়ুরোপের মত অত শীঘ্র ভারত মুসলমানের কবলে পড়ে নাই—বেশ কয়েক শতাব্দী যে তাহারা মুসলমানদিগকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিয়াছিল সে কেবল রাজপুতদের অতুলনীয় বীরত্বের গুণে। তখন হিন্দুসমাজের আর এমন জীবন নাই যে ইহাদের আত্মসাৎ করিয়া লয় আর ইহারাও শক, হূণদের মত কেবল বিভিন্ন ভাব ও চিন্তা মাত্র আনে নাই—একেবারে বিরুদ্ধ ভাব ও চিন্তা লইয়া আসিয়াছে। কাজেই ইহাদের আত্মসাৎ করা সহজ হইল না।

বিরুদ্ধ শক্তি

মুসলমান-আক্রমণে তীর্থমন্দির ও নানাবিধ ধর্ম্মক্ষেত্র বার বার বিপন্ন হইল সত্য, কিন্তু, ধর্ম্মের প্রধান স্থান হৃদয়-মন্দির ক্রমে জাগ্রত হইয়া উঠিতে লাগিল।

নব আগত আদর্শ ও সাধকদের মাহাত্ম্যের কাছে পাছে হার মানিতে হয় এই ভাবনায় ভারতের সাধকেরা তাঁহাদের বিস্মৃত ও পরিত্যক্ত পুরাতন মহৎ আদর্শগুলি আবার আনিয়া সকলের সম্মুখে ধরিতে লাগিলেন ও সাধনায় প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। ইহাই মধ্যযুগের নব ভক্তি, সাধনা ও অধ্যাত্ম-দৃষ্টির মূলে।

দক্ষিণে দ্রবিড়দের ভক্তি তীর্থ-প্রতিমার প্রতিঘাতে যেমন হৃদয়ে হৃদয়ে জাগিয়া উঠিতেছিল, মুসলমানের সাধনা ও

বিরুদ্ধভাবের প্রতিঘাতে উত্তরেও তেমনি ভক্তি জাগিয়া উঠিতে লাগিল। গুরু রামানন্দ এই উভয়কে একত্র করিলেন। তিনি দক্ষিণের দীক্ষা লইয়া উত্তরে আসিলেন। সংস্কৃত ছাড়িলেন—জাতি-নির্বিশেষে ভাষায় জ্ঞান-ভক্তি উপদেশ করিলেন। নবযুগের আরম্ভ হইল। মুসলমানেরাও এই ভাবের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইতে লাগিলেন। তাঁরা দৃঢ় নিষ্ঠা, শুদ্ধ একেশ্বরবাদ, কঠোর সাধনা সঙ্গে আনিয়াছিলেন। ক্রমে তাহাতে ভারতের রঙ্ ধরিতে লাগিল—ক্রমে এই উভয় ভাবের মিলনে মধ্যযুগের ভাবের ঐশ্বর্য্য আবার আশ্চর্য্যরূপে সম্পন্ন হইয়া উঠিতে লাগিল।

রামানন্দ ও নবযুগ

বাহিরের নানা কারণে ভারত তাহার শক্তি বাহিরে হারাইয়াছিল বটে—কিন্তু সে শক্তি তাহার অন্তরে সুপ্ত হইয়া ছিল। সেই শক্তি পূর্ণ জাগরণের জন্য বাহিরের কোনো আঘাতের উপলক্ষ্য খুঁজিতেছিল। এই উপলক্ষ্যটি ঘটিল মুসলমানদের আগমনে। মধ্যযুগের এই জাগরণে সহায়তা করিয়াছিল বলিয়া মধ্যযুগের জাগরণের ইতিহাসে মুসলমানদের সাধনার উল্লেখই প্রথমে করা উচিত।

মুসলমান সাধনা

তখনও যে ভারতে সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধি ও তীক্ষ্ণ চিন্তাশক্তির অভাব ছিল তাহা নহে। তখনও উচ্চ শ্রেণীর চিন্তাশীলেরা ন্যায়, দর্শন, শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতি নানাবিধ চিন্তায় তাঁহাদের অসাধারণ চুলচেরা বিশ্লেষণ-ক্ষমতায় জগৎকে চমৎকৃত করিতে পারিতেন—কিন্তু অভাব ছিল যথার্থ জীবনের যোগদৃষ্টির ও মহান্ আদর্শের।

যোগদৃষ্টির অভাব

তখন আদর্শ, দৃষ্টিশক্তি ও সৃষ্টিশক্তি ক্ষুদ্র ক্ষীণ ও সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিয়াছে।

মুসলমান সাধক

ইতিহাসে মুসলমানদের আগমন কেবল রাজা-রাজড়াদের কথা লইয়াই পরিপূর্ণ। রাজা-রাজড়ার সৈন্য-সামন্তদের অভিযান বার বার ঘটিয়াছে। নগরের পর নগর, রাজ্যের পর রাজ্য অধিকৃত হইয়াছে, কিন্তু সে ভাবে তো বহু বহু লোকের হৃদয় জয় করা সম্ভব হয় নাই। রাজাদের আগমনে, লোক-লস্করের তাড়নায় প্রাণভয়ে ভীত হইয়া বহু লোক ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছে সত্য, তবু ভারতের যথার্থ হৃদয়-জয় রাজা-রাজড়ারা বা সৈন্য-সামন্তরা করে নাই; তাহা ঘটিয়াছিল কেবল মুসলমান সাধু ও সাধকদের আগমনে। ভয়ে ভীত, লোভে লুব্ধ, অথবা নিজের সমাজ ও ধর্ম্মের সঙ্গে যাহাদের স্বার্থের আঘাত লাগিয়াছে এমন বহু বহু লোক প্রয়োজনের তাগিদে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিল। কিন্তু যাহারা হৃদয়ের ও ভাবের তাগিদে নূতন আদর্শ খুঁজিল তাহারা নব সত্য পাইল কোথায়?

উপেক্ষিত সমস্যা

ধর্ম্ম ও সমাজ-ব্যবস্থা যখন বৃহৎ সত্য হইতে ভ্রষ্ট, তখন সমাজের উপেক্ষিত এমন বহু লোক ছিল যাহাদের সমস্যার সমাধান তখনকার প্রাণ-শক্তিহীন দৃষ্টিশক্তিহীন সমাজ করিয়া উঠিতে পারে নাই। উপায়ান্তর না থাকিলে হয়তো সেই সব উপেক্ষিত ও লাঞ্ছিত লোক সমাজের অবিচার অগত্যা মাথায় পাতিয়া লইয়া দীর্ঘকাল সবার পদতলে পড়িয়া থাকিত। কিন্তু এখন একটি নূতন শক্তির আবির্ভাব ঘটিল—বিদেশ হইতে সব সাধকেরা তাঁহাদের

বিভিন্ন আদর্শ লইয়া সাধনার জন্য ভারতের নানাস্থানে বসিয়া গেলেন। এমন অবস্থায় যাহাদের সমস্যার সমাধান হয় নাই তাহারা স্বাভাবিক নিয়মে ঐ সব সাধকের চারিদিকে আসিয়া সমবেত হইতে লাগিল। তাঁহাদের সাধনার পীঠগুলিই এক একটি তীর্থ হইয়া উঠিতে লাগিল।

সাধক মুসলমান ও শাস্ত্রপন্থী মুসলমান

এ বিষয়েও যে সব নিষ্ঠাবান্ স্বধর্ম্মনিরত পরমতাসহিষ্ণু মুসলমান শাস্ত্রপন্থীরা আসিলেন তাঁহারা তেমন করিয়া সকলের হৃদয় জয় করিতে পারেন নাই—যেমন করিয়া জয় করিলেন ভাবুক ও সূফী শ্রেণীর আধ্যাত্মিকভাবে ভরপূর মুসলমান সাধকেরা। অন্য সব প্রকারে সংখ্যাবৃদ্ধি বেশি পরিমাণে হইলেও যথার্থ অধ্যাত্ম-শক্তির মূলে এই সব ভাবুক সাধকরাই।

দাতা গঞ্জ বখ্‌শ

স্বাভাবিক কারণে এই সাধকেরা প্রথমেই পাঞ্জাব ও সিন্ধুদেশে আসিলেন—কারণ, এই সব স্থান দিয়াই তাঁহাদের ভারতের দিকে আসিবার পথ। এই সব সাধকদের নাম করিতে গেলে প্রথমেই মনে আসে বিখ্যাত সাধক মখ্‌দুম সৈয়দ অলি অল্‌-হুজ্‌রীরীর নাম (Makhdum Syed Ali al-Hudjwiri)। তাঁহার প্রচলিত নাম দাতা গঞ্জ বখ্‌শ। তাঁহাকে অল্‌-জুল্লাবীও বলে। গজনীর কাছে জুল্লাব ও হুজরের নামক স্থানে তিনি পূর্ব্বে বাস করিতেন। জীবনের প্রথম ভাগে তিনি নানা দেশ পর্য্যটন করিয়া অবশেষে লাহোরে আসিয়া তাঁহার সাধনার ক্ষেত্র করেন। সেখানেই তিনি দেহত্যাগ করেন। লাহোরে ভাটী দরওয়াজার কাছে তাঁহার সমাধিস্থল আজও হিন্দু-মুসলমান বহু যাত্রী

শ্রদ্ধাভরে দর্শন করিতে আসেন। সেইখানেই তাঁহার সমাধিস্থান বা মজার বিদ্যমান। সেই মজারে দরজার উপর একটি শিলালেখের দ্বারা জানা যায় তাঁহার মৃত্যুকাল ৪৬৫ হিজরাব্দ বা ১০৭২ খৃষ্টাব্দ।

প্রতি বৃহস্পতিবার সেখানে বহু যাত্রী আসে; শ্রাবণ মাসের চতুর্থ বৃহস্পতিবারে বার্ষিক বিরাট্ মেলা বসে। তাঁহার রচিত কশ্‌ফ অল্‌-মহজুব (Kashf al-Mahjúb) "আবরণ উন্মোচন" বা 'গূঢ়ার্থ প্রকাশ' সূফীভাবে সাধনার্থীর পক্ষে অমূল্য গ্রন্থ। সেখানকার লোকদের মতে ভারতে সূফীদের তিনি আদিগুরু। তাঁহারই সাধনাস্থানে নাকি খ্বাজা মোইনুদ্দীন ও খ্বাজা কুতবুদ্দীন কাকী ও খ্বাজা বা বাবা ফরীদুদ্দীন প্রভৃতি সাধকেরা সাধনা করিয়া সত্য লাভ করেন।

তখনো দেখিলাম সেখানে পাঞ্জাবের নানা সূফী সাধকের সাধনার স্থান হইতে তীর্থযাত্রীরা আসিয়াছেন। কেহ আসিয়াছেন মীয়াঁ মীর সাহেবের স্থান হইতে, কেহ আসিয়াছেন শাহদর মালী হইতে, শাহ মহম্মদ গোনী সাহেবের স্থান হইতে, পাক দোনা সাহেবের স্থান হইতে, মাধো লাল হুসেনের স্থান হইতে। লাহোরের নিকটবর্ত্তী মীর জঞ্জানীর মজার হইতে ও রাবল-পিণ্ডীর নিকটবর্ত্তী তৌসের খ্বাজা স্থলেমানের স্থান হইতেও কেহ কেহ আসিয়াছেন।

কশ্‌ফ অল্‌-মহজুব

কশ্‌ফ অল্‌-মহজুব (Kashf al-Mahjúb) গ্রন্থে হুজরীরী উপদেশ করিয়াছেন সাধনার্থী সদ্‌গুরুর নিকট অন্ততঃ ৩ বৎসর শিষ্যত্ব করিবেন। প্রথম বৎসর নিরভিমান হইয়া সকল মানবের সেবা করিতে

হইবে। দ্বিতীয় বৎসর সকল কর্ম্মকে ভগবদ্‌ভাবে অনুগত করিয়া ভগবানের সেবা করিতে হইবে।

গুরুভক্তি

তৃতীয় বৎসরে আপনার যথার্থ স্বরূপ বুঝিতে হইবে, নিজের হৃদয়—নিজের অন্তর দেখিতে হইবে।

সূফীদের মধ্যে 'ফনা' হইল সাধনার অতি গভীর কথা। 'ফনা' হইল জীবন্তে মরণ বা অহমকে লোপ করিয়া দেওয়া। হুজরেরী বলেন সাধনার জগতে 'গরীবী' হইল—জগতের সর্ব্ববস্তু হইতে বিমুখ হইয়া সম্পূর্ণ অহম্ বিলোপ করিয়া সেই পূর্ণ একে দেখা। এই সাধনার দ্বারা সাধক নিত্যজীবনের পূর্ণতা লাভ করে। তখন তাহার অহমিকা-আচ্ছাদিত জীবধর্ম্ম বিলীন হইয়া যায় এবং ভগবানের কৃপায় ভগবদ্‌ভাবে সে পূর্ণ হইয়া উঠে। তখন তাহার সকল স্বত্ব ও সম্বন্ধের অবসান হইয়া যায়। ইহাই হইল 'ফনা'। তিনি আরও বলেন 'ফনা' বলিতে ব্যক্তিত্বের নাশ বুঝায় না। সাধনার বাধাস্বরূপ মর্ত্ত্য ভাবগুলি ঘুচিয়া গিয়া যথার্থ সত্যে ও সত্ত্বগুণে পূর্ণ হইয়া ওঠার নামই হইল 'ফনা'। প্রেমের ফনার পথের অবস্থাই হইল "হাল" বা বাউল বৈষ্ণবদের "দশা"। ইহার জন্য অন্তর্দৃষ্টি, শ্বাসজপ প্রভৃতি উপায়—সকলের উপরে ভগবানের দয়া।

ফনা

হাল, দশা

ইহার পরেই চিশ্‌তিয়া সূফী সম্প্রদায়ের প্রভাব ভারতে পৌঁছিল। এই সম্প্রদায়ের গুরু খাজা আবু আহমদ আবদাল চিশ্‌তী (মৃত্যু ৯৬৬ অব্দ) দশম শতাব্দীতে তাঁর মত প্রচার করিলেও ভারতে

চিশ্‌তিয়া

ইহা আনিলেন খ্বাজা মুইন অলদীন চিশতী। ১১৪২ খ্রীস্টাব্দে সীস্তানে তাঁর জন্ম। তিনি তৎকালের প্রধান প্রধান সব সূফী গুরুর সঙ্গে যোগ স্থাপন করিবার জন্য খুরাশান হইয়া বাগ্‌দাদে আসিলেন। করমানী, কুব্‌রা, সুহ্‌ররবর্দী প্রভৃতি গুরুর সঙ্গে তাঁর যোগ ঘটিল। ১১৯৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি দিল্লীতে আসিলেন বটে কিন্তু সেখানে বাস করিয়া সাধনা করা তাঁহার পছন্দ হইল না, তিনি আজমীরে হিন্দুর পবিত্র স্থান পুষ্করের কাছে আসিয়া বাস করিলেন। ১২৩৬ খ্রীস্টাব্দে এখানে তিনি দেহত্যাগ করেন। ভারতীয় সূফীরা বলেন তিনি ভারতের পীরদের সাহানশাহ বা সম্রাট্‌। তিনি ভারতের সূর্য্য, 'আফতাব-ই-মুল্ক-ই-হিন্দ'। তাঁর দরগায় হিন্দু-মুসলমান যাত্রীর ভিড় লাগিয়াই থাকে। মহামতি আকবর পায়ে হাঁটিয়া সেখানে তীর্থ করিতে গিয়াছিলেন। বৎসরে ৬ দিন এখানে বিশেষ মেলা হয়। এখানে হিন্দু-মন্দিরের মতই দরগার নহবতখানায় প্রহরে প্রহরে নহবৎ বাজে, প্রত্যেক পবিত্র স্থানের পাশে বিখ্যাত গায়িকারা ধনী যাত্রীদের অনুরোধে গান করিয়া বিস্তর উপার্জ্জন করে। সাধক মুইন অলদীনের সাধনা ভারতে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল— হিন্দুদের মধ্যেও তাহা অনুভূত হয়। সেখানে তীর্থযাত্রীদের মধ্যে একদল ব্রাহ্মণ দেখিয়াছি যাহাদিগকে হুসেনী ব্রাহ্মণ বলে।

মুইন অলদীন

এই হুসেনী ব্রাহ্মণেরা ঠিক হিন্দুও নহেন ঠিক মুসলমানও নহেন। হিন্দুদের বিশ্বাস, আচার, ক্রিয়া-কর্ম্মপদ্ধতির সঙ্গে মুসলমান ভাব ও ক্রিয়া-কর্ম্ম মিশাইয়া ইঁহারা তাহা আচরণ করেন। তাঁহারা বলেন

হুসেনী ব্রাহ্মণ

"আমরা ব্রাহ্মণ, আমাদের বেদ হইল অথর্ব্ব বেদ। অথর্ব্ব বেদে হিন্দু ও মুসলমান উভয় মতের সমন্বয় আছে।"

ইঁহাদের ব্রাহ্মণাচার মুসলমানাচার উভয়ই আছে। হিন্দু-ধর্ম্মের অবিরোধী মুসলমান আচার ইঁহারা পালন করেন। রোজার দিনে উপবাস করেন আবার হিন্দু উপবাস ব্রতাদিও পালন করেন। ইঁহাদের নারীরা হিন্দু নারীদের মত বেশ-ভূষা করেন। সধবারা হিন্দু সধবার চিহ্ন ধারণ করেন। পুরুষেরা ভিক্ষার সময় হুসেনের নাম ব্যবহার করেন।

ও-সব দেশে আরও অনেক আধা-হিন্দু ও আধা-মুসলমান শ্রেণী আছে, তাহাদের মধ্যে ইঁহারা সম্মানিত। আগ্রা ও রাজপুতানা প্রদেশে মালকানা রাজপুতেরা হিন্দুভাবেই থাকেন, রাম নাম ব্যবহার করেন, হিন্দু আচার ক্রিয়া-কর্ম্মই করেন, আবার কখনও কখনও দরগা প্রভৃতিতেও যান। সাধারণ শ্রেণীর হিন্দু হইতে তাঁহাদের কোনো প্রকার ভিন্নতা নাই।

ইমামশাহী সম্প্রদায়ের পুরোহিত বা "কাকা" শ্রেণী কতকটা হুসেনী ব্রাহ্মণের মত। শাহদুল্লা সম্প্রদায়ের লোকেরাও অথর্ব্ববেদের ও হিন্দু-মুসলমান-সমন্বয়াবতার 'নিষ্কলঙ্কে'র দোহাই দেন। তাঁহার প্রধান এক শিষ্য খাজা কুতব অলদীন কাকী ফারগানা হইতে বহু সাধকের কাছে গিয়া অবশেষে মুইন অলদীনের কাছে আসেন এবং তাঁহাকে গুরু বলিয়া স্বীকার করেন। দিল্লী কুতব মিনারের কাছে তাঁর সমাধি স্থানে; এখনো বহু যাত্রী সমবেত হন। গুরুর মৃত্যুর বৎসরেই তাঁরও মৃত্যু ঘটে।

কুতব অলদীন কাকী

ফরীদ শকরগঞ্জ

তাঁহার আর একজন প্রধান শিষ্য শেখ ফরীদ অলদীন শকরগঞ্জ। ইনি উপাসনা করিয়া এমন মাধুর্য্য অনুভব করিতেন (অনেকে বলেন উপাধানের নীচে মিশ্রী পাইতেন) যে তাঁর নাম হইল শক্কর বা শর্করগঞ্জ। মুসলমানেরা বলেন পাঞ্জাবে মণ্টগুমারী জেলায় শতদ্রু নদী তীরে আজুধান নগর ছিল। এখান হইতে ডেরা গাজী খাঁ ও ডেরা ইসমাইল খাঁর দুই পথ গিয়াছে। শকরগঞ্জ এখানে সাধনা করায় ইহার নাম হইয়া গেল 'পাক পত্তন' বা পবিত্র তীর্থ। কীল্‌হণ একবার পাক পত্তনে মুসলমানদের সম্পূর্ণ পরাজিত করেন। মহরমের সময় এখানে সুদূর আফগানিস্থান ও মধ্য এশিয়া হইতেও যাত্রী আসে। ইঁহারই প্রভাবে দক্ষিণ পাঞ্জাবে মুসলমান-ধর্ম্ম প্রসার লাভ করে। ইনি উপদেশ করিতেন যে স্বর্গের পথ অতি সঙ্কীর্ণ, তাই এখানে দেয়ালে একটি সঙ্কীর্ণ ছিদ্র করা আছে। স্বর্গকামী যাত্রীরা মহর্‌রম পঞ্চমী রাত্রে শুভ নির্দ্দিষ্ট মুহূর্ত্তে তাহা দিয়া কষ্টে যায়। ঐ ছিদ্রের নাম স্বর্গদ্বার। ১২৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দেহত্যাগ করেন। ইঁহারই বংশে বিখ্যাত কবি শেখ শরফুদ্দীনের জন্ম। সাহিত্য-ক্ষেত্রে তিনি মজ্‌মুল নামে প্রসিদ্ধ।

সাবির চিশ্‌তী

তাঁহার এক শিষ্য 'সাবির চিশ্‌তী' সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক অহমদ সাবীর। ১২৯১ খ্রীষ্টাব্দে রুড়কীর কাছে তিনি দেহত্যাগ করেন।

নিজাম অলদীন ঔলিয়া

শকরগঞ্জের প্রধান শিষ্য হইলেন নিজাম অলদীন ঔলিয়া। ১২৩৮ খ্রীষ্টাব্দে বদাউনে তাঁহার জন্ম। ২০ বৎসর যখন তাঁহার বয়স তখনই গুরু তাঁহাকে স্বীয় ভবিষ্যৎ-

প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করেন। বিখ্যাত কবি আমীর খুসরু ও কবি অমীর হসন দিহ্‌লবী তাঁর শিষ্য। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক জিয়া অলদীন বরণীও তাঁর শিষ্য। ওলিয়ার দরগায় বহু হিন্দু-মুসলমান যাত্রী যায়। ইঁহার শিষ্যসাধক চিরাগ-দিল্লীর দরগাও প্রসিদ্ধ।

সলীম চিশ্‌তী

শেখ সলীম চিশ্‌তীর দরগা ফতেহ্‌পুর সিকরীতে। ইঁহার আশীর্ব্বাদে জাহাঙ্গীরের জন্ম হয়। ইনি একটি গুহায় বাস করিতেন। আকবর তাঁহার দরগা রচনা করিয়া দেন। ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু ঘটে।

সিন্ধ চিশ্‌তী

সিন্ধুদেশে ও পাঞ্জাবে চিশ্‌তী-মত প্রবর্ত্তন করেন খ্বাজা নূর মহম্মদ। ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

সুহ্‌রবর্দী

সুহ্‌রবর্দী শাখার ভারতে প্রবর্ত্তক হইলেন বহা অলদীন জকরিয়া। মুলতানে তাঁর জন্ম ও মৃত্যু ; বগ্‌দাদ তাঁর দীক্ষাস্থান। তাঁর মৃত্যুকাল ১২৬৬ খ্রীষ্টাব্দ। সৈয়দ জলাল অলদীন সুর্খ-পোষ বোখারা হইতে আসিয়া ইঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন, অবশেষে উচ্ছ নগরে বাস করেন, ১২৯১ খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার পৌত্র মখদুম-ই জহানিয়াঁ (মৃত্যু ১৩৮৪ খ্রীঃ) বিখ্যাত সাধক ছিলেন। তাঁহার পৌত্র বরহান অলদীন কুতব-ই আলম গুজরাতে গিয়া বাস করেন। বট্‌বাতে তাঁর সমাধি একটি পবিত্র তীর্থস্থান, ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর পুত্র শাহ আলমের দরগা আহমদাবাদের কাছে রসূলাবাদে ; সৌন্দর্য্য হিসাবেও তাহা বিখ্যাত।

সুর্খ-পোষ

কাদিরী শাখার আদিগুরু অব্দ্ অল কাদির অল জীলী মহাপণ্ডিত ও বড় লেখক ও বক্তা ছিলেন।

কাদিরী

তাঁহার বংশীয় সৈয়দ মুহম্মদ এই মতবাদ ভারতে আনেন। উচে ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। বিখ্যাত সাধক মীয়াঁ মীর এই শাখারই অন্তর্গত। দারা শিকোহ মীয়াঁ মীরের একান্ত অনুরাগী ছিলেন এবং সফিনাত-ই ঔলিয়া নামক গ্রন্থে সাধারণতঃ ইঁহার জীবনী রচনা করিয়াছিলেন। ১৬৩৫ খ্রীষ্টাব্দে লাহোরে মীয়াঁ মীরের মৃত্যু হয়। ইঁহারই এক শিষ্য মুল্লা শাহ কাশ্মীরে প্রচার করেন।

বাঙ্লা দেশে শাহ জলাল, বিহারে মখদুম শাহ প্রভৃতি সাধকেরা বহুল প্রচার করিয়া যান।

বাংলা ও বিহার

সূফী মতবাদী সাধকেরা যথাসম্ভব কোরাণের সহিত যোগ রক্ষা করিয়াই চলিতেন। তবু অনেকে আপত্তি করেন যে, এই সব মতবাদের দ্বারা কোরাণ-প্রবর্ত্তিত বিশুদ্ধ পন্থা রক্ষিত হয় নাই। এই অভিযোগের উত্তরে বুরহানপুরের মুহম্মদ ফজল অল্লাহ একখানা গ্রন্থ রচনা করিয়া প্রমাণ করিতে বাধ্য হন যে সূফী মতবাদের সহিত কোরাণের বিরোধ নাই। গ্রন্থখানির নাম 'অল তুহ্ফল অল মুরসল ইল'ল নবী।' ১৬২০ খ্রীষ্টাব্দে ফজল অল্লাহ পরলোক-গমন করেন। তিনি প্রমাণ করেন এই সব সূফী মতবাদীরা 'বা-শরা' বা শাস্ত্রানুমোদিত। তবু এমন বহু শাস্ত্র-অননুমোদিত 'বেশরা' মতবাদের উদ্ভব হইল যাহা কিছুতেই ঠেকান গেল না।

কোরাণের সহিত সম্বন্ধ

অনেকে মনে করেন ভারতে সূফীদের যেমন প্রয়োজন ছিল

সকলের হৃদয় জয় করিতে, তেমনি তাঁহাদের স্বাধীনতা যখন সাধারণের মধ্যে স্বেচ্ছাচারিতায় পরিণত হইল তখন নিষ্ঠাবান, শাস্ত্রসম্মত-আচরণশীল ধার্ম্মিকদেরও প্রয়োজন ঘটিল। আদি বিজেতাদের শাস্ত্রবদ্ধ ধর্ম্ম ক্রমে যখন সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিল তখন নিজামুদ্দীন প্রভৃতি সূফী সাধকেরা সকলের হৃদয়-স্পর্শ-করা প্রেমধর্ম্ম প্রচার করিলেন। আকবরের সময় তাহা সকলের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইল; আওরংজেবের সময় শর্মাদ প্রভৃতি নগ্ন সাধকের মধ্যে স্বাধীনতার কিছু বাড়াবাড়ি হইল। তখন আওরংজেব ও অলবিহারী প্রভৃতি পণ্ডিতেরা আবার সব কিছু সংযত করিয়া আনিলেন। এই শর্মাদের রুবাইয়াৎও সাধকদের কাছে খ্যাত। আওরংজেবের আদেশে শর্মাদ নিহত হন।

সিন্ধুদেশে সূফীদের স্বাধীনতা কিছু বেশি দূরে অগ্রসর হইয়াছিল। আকবরের বন্ধু ও মন্ত্রী আবুল ফজল ও ফৈজীর পূর্ব্বপুরুষ আরব দেশ হইতে আসিয়া সিন্ধুদেশে অবতরণ করেন, পরে ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ জোধপুর নাগোরে চলিয়া যান। তাই ইঁহাদের পিতার নাম মুবারক নাগোরী। তিনি গ্রীক দর্শন ও সাহিত্যে প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন। এই পরিবার শাস্ত্র-অনুশাসনের বিশেষ ধার ধারিতেন না, যদিও এই পরিবারে পিতা ও পুত্রেরা কোরাণাদিতে পণ্ডিত ছিলেন, এমন কি সে সম্বন্ধে টীকা প্রভৃতিও রচনা করিয়াছেন।

সিন্ধু সূফী

মুবারক নাগোরী

মুবারকের প্রথম পুত্র ফৈজী ১৫৪৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। আকবর তাঁহাকে কবীশ্বর উপাধি দেন। তিনি মহাভারতের

অনুবাদ করেন ও কোরাণের টীকা রচনা করেন। রাজকুমারদের তিনি শিক্ষদাতা ছিলেন। আকবরের তৌহিদ ইলাহী দলের তিনি একজন সভ্য ছিলেন।

ফৈজী

ফৈজীর কনিষ্ঠ আবুল ফজল ১৫৫১ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৫ বৎসর বয়সে তিনি সর্ব্বশাস্ত্রে ও বিজ্ঞানে পণ্ডিত হন। ইহার পর দশ বৎসর তিনি অধ্যাপনা করেন। কিন্তু মনে তাঁর শান্তি ছিল না। আকবরনামায় তিনি লিখিয়াছেন—'দিনের বেলা তো বিজ্ঞানাদি আলোচনায় কোনো মতে কাটিত কিন্তু রাত্রে আমার নিদ্রা ছিল না। আমি নগরের বাহিরে ময়দান পার হইয়া আধ্যাত্মিক সম্পদে সম্পন্ন দীন-দরিদ্র সাধুদের কুটীরে যাইতাম—কিন্তু তবু হৃদয়ের ব্যথার ঔষধ মিলিল না। এক একবার ভাবিতাম চীনদেশের জ্ঞানীদের কাছে যাই, আবার ভাবিতাম দরাজ দেশের সন্ন্যাসীদের কাছে যাই, কখনো ভাবিতাম তিব্বতের লামাদের সঙ্গে গিয়া আলাপ করি, কখনো বা হিস্পানের পর্ত্তুগালের যাজকদের দিকে মন টানিত, কখনো বা ভাবিতাম পারস্য দেশের অগ্নিপূজকদের কাছে গিয়া জেন্দা-বেস্তার গূঢ় রহস্য জানিয়া লই। আমার নিজধর্ম্মের অনুরাগী বা যুক্তিবাদীদের প্রতি আর আমার আস্থা ছিল না।'

আবুল ফজল

স্বাধীন মতবাদের জন্য এই পরিবার উলেমাগণের কোপে পতিত হয়। সকলে তাই আগরায় পলাইয়া আসেন। আকবরের সঙ্গে দেখা হওয়ায় এঁরা একটা মহৎ আশ্রয় পাইলেন। ঐতিহাসিক বদায়ুনী

আকবর

কিন্তু এঁদের উপর অত্যন্ত বিরূপ। তিনি বলেন, "এঁরাই আকবরকে নষ্ট করেন আর আবুল ফজল এই সব মতবাদের আগুনে ডুনিয়া দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হন।" আবলফজলও মহাভারতের পারস্য-অনুবাদে সহায়তা করেন। আকবরের স্বাধীন একেশ্বরবাদে ইনি একজন বড় সহায় ছিলেন।

আজিজ কূকা

আকবরের একেশ্বরবাদীর দলে একজন ছিলেন আজিজ কূকা। তিনি মক্কায় তীর্থ করিতে গিয়া সেখানকার গোঁড়ামী দেখিয়া প্রচলিত আচার ব্যবহারের ধর্ম্মে বীতশ্রদ্ধ হন।

খানখানাঁ

ফৈজী আকবরের জন্য বেদান্ত গ্রন্থ সংস্কৃত হইতে অনুবাদ করেন, রামায়ণ মহাভারতাদি গ্রন্থও অনুবাদ করেন। আকবরের মন্ত্রী আবদুল রহীম খানখানাঁ (১৫৫৩-১৬২৩) আরবী, পারশী, সংস্কৃত ও হিন্দীতে প্রবীণ ও হিন্দী-ভাষায় চমৎকার কবি ছিলেন। তাঁর 'রহীম সতসঈ' চমৎকার হিন্দী কাব্য। তিনি ভক্ত তুলসীদাসের বন্ধু ছিলেন এবং তুলসী রামায়ণের একজন বড় অনুরাগী ছিলেন। সূরদাসের কৃষ্ণভক্তিপর কাব্যগুলি তাঁর কৃপায় অনেকটা রক্ষিত হইয়াছে, এই কথা অনেকে বলেন।

দারা শিকোহ

আকবরের পুত্র জাহাঙ্গীর ও পৌত্র শাহজহান ধর্ম্মসম্বন্ধে অনেকটা উদাসীন-ভাবাপন্ন ছিলেন। শাহজহান নাকি একবার তাঁর উদাসীনতার জন্য বাবা-ই-কোহ অর্থাৎ পর্ব্বতবাসী মুসলমান সাধকের হাতে লাঞ্ছিত হন। শাহজহানের পুত্র দারা শিকোহ ধর্ম্মসম্বন্ধে গভীর চিন্তা করিতেন। তাঁর হৃদয় ও দৃষ্টি অত্যন্ত উদার ছিল, সকল

ধর্ম্মের সকল মতবাদের ভেদাভেদকে তিনি গভীর যোগদৃষ্টির দ্বারা দেখিতে পারিতেন। মীয়াঁ মীরের প্রতি অনুরাগবশতঃ সাধকদের জীবনবৃত্তান্ত প্রকাশ করিতে দারা শিকোহ সফিনাত-ই-ঔলিয়া গ্রন্থ লেখেন। তাঁর সভায় হিন্দী কবির দল, সংস্কৃত কবি জগন্নাথ মিশ্র প্রভৃতি, কবীরপন্থী, দাদূপন্থী প্রভৃতি সাধুগণ, পাঞ্জাবের সাধক বাবালাল প্রভৃতি সর্ব্বদাই আসা যাওয়া করিতেন। হিন্দুর অধ্যাত্মবাদ ও সূফীদের মতামতের সমন্বয় করিয়া তিনি এক গ্রন্থ রচনা করেন—তাহার নাম "মজমা অল বহরইন"। উপনিষদ্ ও আত্ম-পরমাত্ম-বিষয়ক অনেক গ্রন্থ তিনি নিজে অনুবাদ করেন ও অনুবাদ করান। এই অনুবাদগুলির নাম সির্‌র-ই-অকবর। নানাধর্ম্মের মৈত্রী ও হিন্দু-মুসলমান সাধনার সমন্বয় বিষয়ে তাঁর অনেক স্বপ্ন ছিল, সেগুলি তিনি সিদ্ধ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তবু আওরংজেবের পুত্রদের উপর তাঁর সাহিত্যিক ভাবের প্রভাব হইয়াছিল। আওরংজেবের পুত্র

আজম শাহ

আজম শাহ বৈষ্ণব কবি বিহারীর যে সপ্তশত পদাবলী সংগ্রহ করেন, সে সংগ্রহ আজও সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া সর্ব্বজন-সম্মানিত। এই জন্য নিষ্ঠাবান্ অনেকে এই দুঃখ করিয়াছেন যে আওরংজেবের পুত্র হইয়াও আজম শাহ এমন সব সাহিত্যের কাছে হৃদয় বিকাইয়াছেন! রসবিলাস, প্রেমচন্দ্রিকা প্রভৃতি প্রণেতা দেব কবিও আজম শাহের আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন। দারার ভগ্নী জাহানারাও দারার ভাবেই অনুপ্রাণিত ছিলেন।

সিন্ধের সূফী ধর্ম্মের কথা আরম্ভ করিয়া নাগোরী ও ফৈজী ফজলের কথায় আমরা আকবর ও দারা শিকোহ পর্য্যন্ত আসিয়া

পড়িয়াছি। সিন্ধে সূফী সাধনা চিরদিনই খুব উদার। ত্রয়োদশ শতাব্দীর কাছাকাছি গজনীতে চারিজন সাধক বন্ধু ছিলেন। তাঁহাদের নাম শাহ কলংদর, ফরীদগঞ্জ, জমালউদ্দীন ও শাহ শকর। তাঁহারা প্রচলিত ধর্ম্মসাধনার সঙ্কীর্ণতায় ব্যথিত হইয়া মনে করিলেন সমুদ্র পার হইয়া কোনো দূর দেশে যাওয়া যাউক। তাঁহারা ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া সব পার্থিব সম্পদ্ ফেলিয়া দিয়া যাত্রা করিলেন। পরিশেষে তাঁহারা সিন্ধুদেশে সেহ্ওয়ানে আসিয়া উপস্থিত হন। সেখানে পীরেরা তাঁহাদের দূর করিতে চান তবু তাঁহারা সেখানে রহিলেন। পরে একজন গেলেন ফরীদগঞ্জে ও আর একজন গেলেন মূলতান উছে।

চহারদোস্ত সিন্ধী

১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সূফী সাধক শাহ করীম জীবিত ছিলেন। তাঁর জীবনীর একস্থানে আছে তিনি আহমেদাবাদের নিকট এক বৈষ্ণব সাধুর কাছে ধর্ম্ম-জীবনে প্রবেশে সহায়তা পান। তিনি করীমকে ওঁকার মন্ত্র জপ করিতে শিক্ষা দেন। জীবনীতে লেখা আছে ঐ মন্ত্রটি যেন তাঁর পক্ষে অন্ধকারগৃহে ঘূর্ণ্যমান দীপের মত হইল। শাহ করীমের জীবনী পারস্য ও সিন্ধী ভাষা মিলাইয়া লেখা।

শাহ করীম

তারপরই নাম করা উচিত শাহ ইনায়তের। তিনি সর্ব্ব-লোকের পূজিত ছিলেন। তখন সিন্ধের কল্হোরা রাজগণ তরবারীর সহায়তায় বহু লোক মুসলমান করিতেছিলেন। বহু লোক কচ্ছ কাঠিয়াওয়াড়ে পলাইতেছিল। ইনায়ত তাঁর আশ্রমে বহু হিন্দুপরিবারকে

শাহ ইনায়ত

আশ্রয় দিয়া রক্ষা করিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল ভগবান্ কোনো সম্প্রদায়বিশেষের সম্পত্তি নহেন। পরিশেষে সিন্ধের রাজারা তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়া দিল্লীশ্বরকে উপহার পাঠান। তাই আজও তিনি 'বেসির' (বিনসির) বা মুণ্ডহীন নামে সকলের শ্রদ্ধা পাইতেছেন। বহরাইচের "শালারগাজী", পানীপথের "বিনসির", বটালায় বাবাচূড়া, লখ্‌খে প্রভৃতি তুলনীয়।

এই সব সাধকদের শিরোমণি হইলেন শাহ লতীফ (১৬৯৮ খ্রীঃ)—সিন্ধের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি ও গায়ক। আজও তাঁর গান নরনারীর কণ্ঠে কণ্ঠে গীত হইতেছে। তাঁর সাধনার স্থান ভীটে প্রতি বৃহস্পতিবার রাত্রে হিন্দু-মুসলমান নরনারীর সম্মিলিত সাধনা চলে। কখনও তাঁরা গান করেন, কখনও সকলে মৌন-ধ্যানে মগ্ন থাকেন। সেখানে কবীর, দাদূ, নানক, মীরা-বাঈ প্রভৃতি ভক্তদের গানও হয়। এই সব গানের সংগ্রহ—প্রাচীন পুঁথি সেখানে আছে।

সিন্ধে প্রায়ই দেখা যায় হিন্দুর গুরু মুসলমান ও মুসলমানের গুরু হিন্দু। ইঁহারা সবাই এক ভাষায় ও এক প্রেমের ভাবে সাধনা করিয়াছেন।

সাম্প্রদায়িক উদারতা

সূফী প্রেমিক কবি বেদিল ও বেকসের (১৮৫৯) গান এখনো নরনারীর কণ্ঠে শোনা যায়। তাঁদের সমাধি-স্থানে বহু দুঃখ-শোক-পীড়িত নরনারী সান্ত্বনা পায়। বেকসের নাম ছিল মহম্মদ হুসেন।

বেদিল ও বেকস

কবি রোহল ও কুতুবও এই পথের পথিক। তাঁদের গান যেমন গভীর তেমনি সুন্দর। এখনও তাঁহাদের দরগাহে মেলায় হিন্দু-মুসলমান

রোহল, কুতুব

নরনারী রাত্রি জাগিয়া তাঁহাদের ও অন্যান্য হিন্দু-মুসলমান সাধকের গান করেন। বেকস মোটে ২২ বৎসর জীবিত ছিলেন, তবু তাঁর প্রভাব অত্যন্ত গভীর।

কুসংস্কারের মমতা

প্রেমের ধর্ম্মে সাধকদের কাছে এই দুই ধর্ম্মের যেরূপ উচ্চ ভাবের মিলন আছে, আবার সাধারণ লোকের কাছে এই দুই ধর্ম্মের প্রচলিত আচার ও সংস্কারগুলি তেমনি মিলিয়া মিশিয়া গিয়াছে।

গিরোট

পাঞ্জাব শাহপুর জেলায় গিরোট তীর্থ হিন্দু-মুসলমান দুই দলেরই পবিত্র স্থান। মুসলমানেরা জমালী সুলতানের ও হিন্দুরা দয়াল ভাবনের নামে সেখানে একত্র হন।

মুসাহুহাগ

মুসাসুহাগের ভক্তরা (১৫শ শতাব্দী) আহমদাবাদের নিকটবর্ত্তী বেচরা দেবীর ভক্তদের মত নারীর বেশ ধারণ করেন। উভয়ের স্থলই কাছাকাছি।

ফত্তু

কাংরা রাণীতালে বাবা ফত্তুর দরগাহ। ইনি হিন্দুসাধক সোধী গুরু গুলাব সিংহের আশীর্ব্বাদে সিদ্ধ হন। পাঞ্জাব ঝাঙ্ জেলায় হিন্দু সাধক বাবা সাহানার স্থান। তাঁর পূর্ব্ব নাম ছিল মিহ্‌র।

মিহ্‌র

তিনি এক মুসলমানের চেলা হইয়া সিদ্ধ হন। তাঁর নাম হইয়া যায় মিহ্‌রশাহ। এখন সেখানে হিন্দু-মুসলমান শ্রদ্ধায় একত্র হন।

কাশ্মীর

কাশ্মীরে প্রায় প্রত্যেকটি জিয়ারত পুরাতন হিন্দুতীর্থে স্থাপিত।

মুলতানের শামস্-ই-তবরেজ মন্ত্রবলে সূর্য্যতেজ ও অগ্নিকে নাকি আয়ত্ত করেন। হিন্দু-মুসলমান উভয় দলের তীর্থযাত্রীই সেখানে যায়।

তবরেজ।

মধ্যপ্রদেশ বহাদুরপুরে সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি মহম্মদ শাহদুল্লা একটি সম্প্রদায় স্থাপন করেন, তাহাতে তিনি হিন্দু-মুসলমান উভয় সাধনাকে মিলাইতে চাহিয়াছিলেন। তাঁর দরগায় এখনো বহু ভক্ত যান। তাঁর মতবাদীদের নাম পীর জাদা। তিনি হিন্দু-মুসলমান শাস্ত্র হইতে বাছিয়া বাছিয়া বচন লইয়া একটি সমন্বয়-শাস্ত্র রচনা করেন। পীরজাদা বলেন বিষ্ণুর দশম অবতার হইলেন "নিষ্কলঙ্ক"—তিনিই আমাদের উপাস্য। এ বিষয়ে গুজরাতের পীরানাপন্থ ও ইঁহাদের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ নাই।

শাহদুল্লা

পীর জাদা

গুজ্‌রাতে পঞ্চদশ শতাব্দীর ইমাম শাহের সম্প্রদায় আছে, তার নাম পীরানাপন্থ বা কাকাপন্থ। এই মতে অধিকাংশই পাটীদার। ইঁহারা হিন্দুভাবে থাকেন, ইঁহাদের হিন্দু নাম ও আচার, তবু ইঁহারা মুসলমান গুরুর শিষ্য। সেই গুরুর পাটীদার সহায়ক আছেন, তাঁদের কাকা বলে। ইঁহারা ব্রাহ্মণের ও কাকাদের দ্বারা ধর্ম্মানুষ্ঠান করান ও মরিলে এঁদের কবর দেওয়া হয়। এখন নবসারী প্রভৃতি স্থানে ইঁহারা ধীরে ধীরে হিন্দুমতে ফিরিয়া যাইতেছেন। ইঁহাদের অবতারও নাকি নকলঙ্কী বা নিষ্কলঙ্কী। ইঁহাদের ৮টি শাখা আছে। মূল স্থান কচ্ছে।

ইমাম শাহ

তাজ নামে এক মুসলমান মহিলা কবি সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কৃষ্ণভক্তিবিষয়ক অনেক চমৎকার গান লিখিয়াছেন। তিনি ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন। ইসমাইলিয়া সম্প্রদায়ের এক গুরু আসিয়া ভারতে বল্লভ-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব গুরুর মত হইয়া হিন্দুদের দীক্ষা দেন। তাঁহারা তাঁহাকে কৃষ্ণের অবতার মনে করেন। এখন এই সম্প্রদায়ের নাম খোজা। ইঁহারা অতিশয় ধনী ব্যবসায়ী। তবে বল্লভাচার্য্য সম্প্রদায়ের মত ইহাতেও অন্ধতা ও গুরুপূজা একান্তভাবে বিরাজিত। এই সম্প্রদায়ে পূর্ব্বে হিন্দু আচার ও নাম ছিল, এখন ইঁহারা ক্রমে বিশুদ্ধ মুসলমান হইতে আরম্ভ করিয়াছেন। কাঠিয়াওয়াড় গড়ড়ায় প্রায় ১৫০টি খোজা-পরিবার স্বামী নারায়ণ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে।

তাজ

খোজা

মুসলমানদের মধ্যে উদারদৃষ্টিসম্পন্ন অনেকে ধর্ম্মের মৈত্রী ও সমন্বয়সম্বন্ধে বহু চিন্তা করিয়াছেন ও গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছেন। চিশ্‌তিয়া সম্প্রদায়ের সাধক মহীউদ্দীনের শিষ্য মালিক মহম্মদ জায়সী (১৫৪০) কবীরের উপদেশে অনুপ্রাণিত হইয়া আত্মা ও পরমাত্মার বিষয়ে অসাধারণ চমৎকার রূপক কাব্য 'পদ্মাবতী' রচনা করেন। তাঁর কাব্য বাঙ্‌লা ভাষায় মুসলমান কবি আলাওল অনুবাদ করেন। হুসেন-গজনবী এই কাব্য পারস্য ভাষায় অনুবাদ করেন। জায়সী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের কাছে সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।

জায়সী

আমেঠির হিন্দু রাজা তাঁর ভক্ত ছিলেন। তাঁর দরগাহ

রাজাই তৈয়ার করাইয়া দেন। রাজা জগৎদেবের সভাপণ্ডিত ও রায়পুরা হলদিয়ার ব্রাহ্মণ কথকদের পূর্ব্বপুরুষ গন্ধর্ব্বরাজ তাঁর বন্ধু ছিলেন। জায়সী অপুত্রক ছিলেন বলিয়া তাঁর বংশ-নাম 'মালিক' তিনি ব্রাহ্মণবন্ধুর পুত্রদের দিয়া যান ও আশীর্ব্বাদ করেন—তোমাদের বংশে সুকণ্ঠ চিরস্থায়ী হইবে, তোমরা ভগবানের গুণগান করিবে। তাই হলদিয়ার কথক ঠাকুরদের উপাধি মালিক।

নুরমহম্মদ

মালিক মহম্মদের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া নূর মহম্মদ (১৭৫০ খ্রীঃ) তাঁহার 'ইন্দ্রাবতী' কাব্য রচনা করেন। ইহা অনেকটা পদ্মাবতীর মতই রূপক আখ্যান।

হসন নিজামী

বেশি দিনের কথা নয় নিজাম উদ্দীন ওলিয়ার বংশধর ও তাঁর দরগাহের হাফিজ, হসন নিজামী তাঁর রচিত 'হিন্দুস্থান কে দো পয়গম্বর রাম ও কৃষ্ণ, সলাম অল্লাহী অলই হিমা'তে, লেখেন যে "কোরাণে আছে সকল দেশেই ভগবান্ তাঁর পয়গম্বর পাঠান। ভারতের মত বিশাল দেশে কি সে কথা মিথ্যা হইবে? অতএব রাম, কৃষ্ণ ও বুদ্ধ সত্যই এদেশের সত্যদ্রষ্টা পয়গম্বর এবং ইঁহাদের উপদেশ প্রামাণ্য।"

ভারতীয় প্রভাব

ভারতে আসিয়া মুসলমান সাধকেরাও হিন্দুসাধনার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইতে লাগিলেন। গুরুর প্রতি যে আনুগত্য হুজরেরীর কশফউল মহজুবে আছে ও সূফী শাস্ত্রে আছে তাহা আরও হিন্দুভাবাপন্ন হইল। অনেক পরবর্ত্তী কালে হাজী সবজ্‌য়ারী (Haji

Sabzwari) যে বলিয়াছিলেন সৃষ্টি ভগবানের আলোকরশ্মি, সেই মতবাদের সঙ্গে উপনিষদের সৃষ্টিবাদ মিলিয়া সাধকদের মধ্যে পরে অনেক নূতন সৃষ্টিরহস্য রচিত হইয়াছিল।

বে-শরা

বাতিনীয়া (Batiniya)দের গূঢ়ার্থবাদের সঙ্গে ভারতের অধ্যাত্মবাদ মিলিতে লাগিল। ক্রমে এমন সব মত দাঁড়াইল যাহাকে মৌলানারা বলিতে বাধ্য হইলেন এসব 'বে-শরা', অর্থাৎ শাস্ত্রের অননুমোদিত। যোগশাস্ত্রের অনুসরণ করিয়া পাঞ্জাবে ও নানা স্থানে মুসলমান যোগীরা যোগের, আসনের, দেহতত্ত্বের, ষট্‌চক্র প্রভৃতি চিত্রসম্বলিত গ্রন্থাদি লিখিলেন। ষট্‌চক্র, কমল-বেধ সব গৃহীত হইল। পাঞ্জাবে এমন পুস্তক একাধিক আমি দেখিয়াছি।

আজাদ

আজাদ (Azad) সম্প্রদায় তো গোঁফদাড়ী কামাইয়া সব শাস্ত্রশাসন অস্বীকার করিল। জালাওনে এদের অনেক সময় দেখা যায়।

তান্ত্রিক রসুলসাহী

আলয়ার রাজ্যে অষ্টাদশ শতাব্দীতে রসূল সাহ তান্ত্রিক মত প্রচার করিতে লাগিলেন। পাঞ্জাবে তাঁদের মধ্যে রসায়ন শাস্ত্র ও কাব্য-সাহিত্য সুপ্রতিষ্ঠিত। ইঁহারা মদ্য পানে কুণ্ঠিত নহেন। লোকেরা মনে করে ইঁহারা অলৌকিক ক্রিয়া করিতে পারেন। ইঁহারা তান্ত্রিকদের মত ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্নাযোগে ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া সহস্রার-সুধা পান করেন। তান্ত্রিকদের মত ইঁহারা চক্রে বসেন ও বীরাচারে সাধনা করেন।

সিন্ধে হিন্দুর জিন্দা-পীরই মুসলমানের খ্বাজা খিজির।

হিন্দুর লাল-মধেরো মুসলমানের সেখ তাহির। লাল-জসরাজই পীর সংঘো। মুলতানের জালালী সম্প্রদায়ের প্রধান, কলংদর উসমানী মের রন্দী বা লাল সাহবাজ ও পীর মংঘো। সেহওয়ানে ১২৭৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। হিন্দু মুসলমান উভয়ের অন্ধ কুসংস্কারও মিলিতে লাগিল। ক্রমে গাজী মিয়াঁ, পাঁচ পীর, পীর বদর, খাজা খিজিরের পূজা চলিল। ডেরা গাজী খাঁর সখী সরর তীর্থ হিন্দু-মুসলমান-শিখের তীর্থস্থান। মুলতানে শের সাহের দরগা হতাশ প্রেমিকদের তীর্থস্থান। বাংলা দেশে সত্যপীর সত্যনারায়ণ হিন্দুমুসলমানের উপাস্য।

কুসংস্কারের সমতা

বাঙলায় বাউল ও জিকির বলিয়া যে সব মণ্ডলী আছে তাহাদিগকে না বলিতে পারা যায় কোনো জাতি, না বলা যায় কোনো সম্প্রদায়। তাহারা না মুসলমান, না হিন্দু। এই বাউলরা গৃহস্থ বাউল, তাঁহারা কতক পরিমাণে মুসলমানও বটেন। তাই নিষ্ঠাবান্ মুসলমানেরা ফতোয়া দ্বারাও ইঁহাদের সংখ্যা লোপ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এরূপ বাউল-বিধ্বংশ ফতোয়া আমি দেখিয়াছি। রঙ্পুর জেলায় পার্ব্বতীপুরের কাছে বাঙ্গালপাড়ায় ও অন্যান্য কোনো কোনো স্থানে, বিশেষতঃ উত্তরবঙ্গের কতকগুলি স্থানে বাউল জাতি আছে। ধর্ম্মের বাউল ইহা হইতে স্বতন্ত্র। ময়মনসিংহের পূর্ব্বভাগে মেঘনাতীরে জিকির জাতি আছে। এই উভয় শ্রেণীরই হিন্দু মুসলমান উভয়বিধ গোঁড়ামির কোনটাই নাই। ইঁহারা গানে সাধনা করেন ও ইঁহাদের মতামত খুব উদার। খানিক বৈষ্ণব খানিক সূফী ভাবে ইঁহারা অনুপ্রাণিত।

বাউল জিকির

প্রতিবাদ

এই পর্য্যন্ত যাঁহাদের নাম করা গেল তাঁরা প্রায় অনেকেই নিজেদের মুসলমান নামে পরিচয় দিয়াছেন—যদিও নিষ্ঠাবান্ মুসলমানেরা বলিয়াছেন—এসব আচার বা-শরা বা শাস্ত্রসম্মত নহে। বহু স্থানে ইহার প্রতিবাদও চলিল, তার মধ্যে পূর্ব্ব বাঙ্‌লার ফরাইজী (Faraidi) সম্প্রদায় উল্লেখযোগ্য।

"ফেরাজী"

ফরিদপুরে হাজী শরিয়ত অল্লার জন্ম জোলার বংশে। তিনি মক্কা যাইয়া সেখ তাহির অল মক্কীর শিষ্য হন। ২০ বৎসর তথায় থাকিয়া ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে দেশে ফিরিয়া ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মত প্রচার করেন। তাঁর মতে, শিষ্যের গুরুর একান্ত আনুগত্য ভালো নয়। তিনি বলেন, ভারত অমুসলমান রাজার অধীন অতএব "দরঅলহর্ব" অর্থাৎ যুদ্ধস্থান। অতএব এখানে ঈদ ও জুম্মা নামাজ চলে না। প্রত্যেকে খুব নিষ্ঠাবান্ আচারী মুসলমান হইবে। পীর, দরগাহ প্রভৃতি পূজা করিবে না—এই মতবাদই ওয়াহাবী। তাঁর পুত্র মুহম্মদ মুহসিন বা দুধু মিয়াঁ তাঁদের সম্প্রদায়কে নানা মণ্ডলে ভাগ করিয়া সুব্যবস্থা করিলেন। তাঁরা প্রচার করিলেন সম্প্রদায়ে ধনি-দরিদ্রে ভেদ নাই। একের বিপদে সকলকে দাঁড়াইতে হইবে। ইঁহাদের কাহারও সঙ্গে বাহিরের কাহারও বিবাদ হইলে ইঁহারা একত্র হইয়া বিরুদ্ধে দাঁড়াইতেন। তাঁদের মতে পৃথিবী ভগবানের, তাই কেহ পুরুষানুক্রমে তাহা অধিকার করিতে বা টেক্স চাহিতে পারে না। তাই পুরাতন মুসলমান, নীলকর ও জমীদাররা ইঁহাদের সঙ্গে সমবেতভাবে লড়িয়াও সহজে কিছু করিতে পারেন নাই।

সৈয়দ অহমদও পশ্চিমভারতে এইরূপ মতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। এই আন্দোলনকে ওয়াহাবী আন্দোলন বলে।

হিন্দুর চেষ্টা

মুসলমানদের মত হিন্দুদের দিক্ হইতেও নানারকম চেষ্টা চলিতে লাগিল, যাহাতে নিজেদের সাধনা ও আদর্শ বাঁচাইয়া রাখা যায়। তার মধ্যে কোন কোন দলের চেষ্টা চলিল নিজেদের শাস্ত্র ও আচার যথাসম্ভব বাঁচাইয়া রাখিয়া তার মধ্যে যতটা স্বাধীনতা চলে ততটা দিয়া। আর কোন কোন দল নিজেদের পুরাতন সব শাস্ত্র ও বন্ধন অতিক্রম করিয়া একেবারে নূতন করিয়া বৃহৎ যোগ ও সমন্বয়ের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মুসলমানেরা প্রথমোক্ত দলকে বলেন "বা-শরা" বা শাস্ত্র-সম্মত, ও অপর দলকে বলেন "বে-শরা বা শাস্ত্র-বহির্ভূত। বাউলদের দেওয়া নাম আরও চমৎকার। তাঁহারা প্রথম দলকে বলেন "দীঘল-ডুরী" বা দীর্ঘ দড়ি-বাঁধা দল অর্থাৎ যাঁদের খোঁটাটা ঠিকই আছে তবে দড়িটা যতটা সম্ভব দীর্ঘ করিয়া যথাসম্ভব স্বাধীনতা যাঁরা পাইতে চান। আর "বে-ডুরী" বা বন্ধনমুক্ত দল। মধ্য-যুগে প্রথমোক্ত দলকে বলে "লোকবেদ পংথী" অর্থাৎ যাঁরা লোকাচার ও বেদাচারকে প্রামাণ্য মনে করেন। অপর দলকে বলেন "অনভৌ-সাচ পংথী" অর্থাৎ যাঁরা অনুভবের দ্বারা প্রত্যক্ষীকৃত সত্যকেই মানেন। আজকার বক্তৃতা প্রধানতঃ হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই এই দীঘল-ডুরী দলদের লইয়া। কাল "বে-ডুরী"দের কথাই প্রধানতঃ বলা হইবে। মুসলমান "বা-শরা" দলের কিছু পরিচয় এতক্ষণ দেওয়া

গিয়াছে। এখন শাস্ত্র-সম্মত হিন্দুর দিকের চেষ্টার কিছু পরিচয় দেওয়া যাউক।

হিন্দু তরফের এই সব চেষ্টার অনেক কথাই আপনাদের সকলের জানা আছে। সময়ও খুব কম, কাজেই যথাসম্ভব সংক্ষেপ করিয়া খুব অল্প কথায় একটু পরিচয় দিব। মুসলমান-দের সাধনার দান সকলের জানা না-ও থাকিতে পারে মনে করিয়া তাহা একটু খোলাসা করিয়া বলিবার চেষ্টা করা হইয়াছে, স্থান ও সময়ের সঙ্কীর্ণতা না থাকিলে আরও কিছু বলার ইচ্ছা ছিল।

মুসলমানদের আসিবার পূর্ব্বেই ভারতের বৈদিক আচার ও ধর্ম্ম বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি নানা মতবাদের আঘাতে মৃতপ্রায় হইয়া আসিয়াছিল। আনন্দতীর্থ, দুর্গ, ভট্ট-ভাস্কর, সায়ণ, মাধব, উবট প্রভৃতি পণ্ডিত ও শ্রুতির টীকাকারেরা তাহা পুনর্জ্জীবিত করার চেষ্টা করিলেন। রাজা বুক হরিহরের আশ্রয় পাইয়াছিলেন বলিয়া চতুর্দ্দশ শতাব্দীতেও সায়ণাচার্য্য বেদের এমন একখানা টীকা রচনা করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রয়াস সুবিদিত, এখানে বলার প্রয়োজন নাই।

বেদব্যাখ্যাকার

মুসলমানদের আসার পর যখন সমাজের নিজেরই জীর্ণতা হইতে সমাজ খান্ খান্ হইয়া ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল, তখন নূতন একটা জীবন দিয়া সকল ভাঙ্গাচোরাকে নবজীবনে জীবন্ত করিয়া যুক্ত করিয়া তোলা সহজ নয়। সমাজ-ব্যবস্থা যখন ভাঙিয়াছে, তখন মনু-টীকাকার মেধাতিথি, কুল্লূকভট্ট, মিতাক্ষরা-টীকাকার বিজ্ঞানেশ্বর (১১শ খ্রী:)

স্মার্ত্ত

চতুর্বর্গচিন্তামণিকার হেমাদ্রি, (১২৬০-১৩০৯) বাংলার রঘুনন্দন প্রভৃতির চেষ্টা চলিল যাহাতে পুরাতন বন্ধনগুলি দিয়া অন্ততঃ ভাঙ্গা অংশগুলি একত্র কোনমতে বাঁধিয়া রাখা চলে। পুরাণ-রচয়িতা ও নিবন্ধকারগণের পাণ্ডিত্য ও বিপুল প্রয়াস দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়।

বেদান্ত আচার্য্য

গৌড়পাদ, শঙ্করাচার্য্য (৮ম শতাব্দী) প্রভৃতি জ্ঞানিগণ জ্ঞানের দ্বারা সকলকে জাগ্রত করিতে চাহিলেন। বৌদ্ধমঠগুলি হীনবল হইতেছিল, শঙ্করাচার্য্য তাঁর চারিমঠের প্রতিষ্ঠা করেন, ছয় দর্শন ও তার টীকাকারদের চেষ্টাও চলিল। তবে সে সব প্রয়াস জ্ঞানী ও বিদ্বান্‌দের লইয়া, সাধারণের তাহাতে বড় আসে যায় না।

তন্ত্র

তার পরেই নাম করিতে হয় তন্ত্রকারগণের। তন্ত্র বলিতে অনেকে কেবল কুৎসিত আচারাদিই বুঝেন। কিন্তু মহানির্ব্বাণ, কুলার্ণব, বিশ্বসার প্রভৃতি তন্ত্র গভীর জ্ঞানের কথায় পূর্ণ। যে জ্ঞান কেবল বেদান্তাদি শাস্ত্রে ও পণ্ডিতগণের মধ্যে আবদ্ধ ছিল, তাহা সরল সহজ ভাষায় আপামর সকলের মধ্যে বিলাইয়া দেওয়ার জন্য এই সব তন্ত্রের যে আশ্চর্য্য প্রয়াস, তাহা ভাবিয়া দেখিলে অবাক্ হইতে হয়।

ক্ষুদ্র জ্ঞান ও পূজাদি পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্ম-সাধনার জন্য মহানির্ব্বাণের যে উপদেশ, তাহা যে-কোন দেশের পক্ষে গৌরবের। ইহাতে সামাজিক আচারের অর্থহীন বন্ধনগুলি ঘুচাইয়া দিয়া আচণ্ডাল নরনারী সকলকেই সাধনার সমান অধিকার

দেওয়া হইয়াছে। দায়ভাগ, সমাজব্যবস্থা, ব্যক্তিগত পারিবারিক ও সামাজিক ধর্ম্মসাধনার পূর্ণ ব্যবস্থা করিয়া সাধনার একটি পরিপূর্ণ নূতন আদর্শ সকলের কাছে ধরিতে তন্ত্রকারগণ চেষ্টা করিয়াছিলেন।

আগমবাগীশ

যাঁহারা ক্রিয়া-কর্ম্ম পূজা-অর্চ্চনা মাত্র লইয়া জীবন কাটাইতে চান, বড় বড় সামাজিক আদর্শে মাথা ঘামাইতে চান না, তাঁদের জন্য আগমবাগীশ কৃষ্ণানন্দ প্রভৃতি তান্ত্রিক সাধকগণ নানা তন্ত্র হইতে তন্ত্রসারের মত তান্ত্রিক কর্ম্মের গ্রন্থ রচনা করিলেন।

পূর্ণানন্দ

ব্যক্তিগত সাধনার্থীর জন্য পূর্ণানন্দ আদি সাধকেরা ষট্‌চক্র-নিরূপণ, যোগ প্রভৃতির প্রচার করিলেন। তারপর তন্ত্রের টীকাকারও কত হইয়া গিয়াছেন।

ভাগবত-ধর্ম্ম

অনেকে বলেন যদু, তুর্বসু, বৃষ্ণি প্রভৃতি পরবর্ত্তী কালের ভারতে আগত জাতি হইতে ভাগবত-ধর্ম্ম এদেশে প্রচারিত হয়। এদেশের ধর্ম্ম-চিন্তার সঙ্গে মিলিয়া এই ভাগবত-ধর্ম্ম এক অপূর্ব্ব ভক্তিবাদে পরিণত হয়। এখানকার যোগমতের সঙ্গেও তার মিলন ঘটিল। মহাভারতের নারায়ণী অংশ রচয়িতা, পঞ্চরাত্রকার, শাণ্ডিল্য-সূত্রকার হইতে আরম্ভ করিয়া নারায়ণ পরিব্রাজক এমন কি তার পরেও অনেক মতিমান্ এই ভাগবত-ধর্ম্মকে সকলের গ্রহণীয় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ভাণ্ডারকর প্রভৃতি পণ্ডিতেরা এবিষয়ে অনেক লিখিয়াছেন, কাজেই আজ তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই।

বুদ্ধের ভক্তগণ যেমন ভগবান্ তথাগতের মধ্যেই সব আদর্শকে পূর্ণভাবে পাইবার চেষ্টা করিয়াছেন ভারতে তেমনি ভক্তেরা শিব বা বিষ্ণুকে বিশেষতঃ বিষ্ণুকে রাম ও কৃষ্ণ ভাবে লইয়া তাঁহাদের সকল আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শের পূর্ণ আধার ও আশ্রয় রচনা করিবার চেষ্টা করিলেন।

শিব, বিষ্ণু

দক্ষিণ ভারতের দ্বাদশ আলরারের ৯ জন অন্ততঃ মানুষ এবং তার মধ্যে অনেকে বেশ নীচকুলজাত এবং 'আণ্ডাল' একজন নারী। পঞ্চম আলরার ডোমজাতীয় শঠকোপের তিরু বায়মোলি (Tiru Vaymoli) বা মুখের বাণী বেদের অপেক্ষা বৈষ্ণব ভক্তদের কাছে অধিক সমাদৃত। আণ্ডাল ও তাঁর পিতা বিষ্ণুচিত্ত আলরার জাতিতে অস্পৃশ্য পারিয়া।

আলরার

মানবহৃদয়ের প্রেমভক্তি লইয়া আলরারেরা নব ভক্তিবাদ রচনা করিলেন। ক্রমে নাথমুনী, আলবন্দার-যামুনাচার্য্য, অর্থ-পঞ্চককার পিল্লে লোকাচার্য্য (১২১৩ খ্রীঃ) প্রভৃতির সময় হইতে রামানুজের সময় পর্য্যন্ত এই নব ভক্তির ধারা সমান উদ্যমে চলিল। ভক্ত আলরারদের বাণী ভক্তিরস দিয়াছিল। নাথমুনী যামুনাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্যেরা জ্ঞানের দিক্ দিয়া সেই ভক্তির বাণীর ধারাকে পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিলেন। জাতিবিচার-শাসিত দক্ষিণ দেশে দ্বাদশ শতাব্দীতে রামানুজ বিষ্ণুভক্তি বিলাইয়া নীচ জাতিকেও উচ্চ করিয়া তুলিলেন এবং দেশীয় ভাষায় শঠ কোপ রচিত (Tiru Vaymoli) তিরু বায়মোলি প্রভৃতি ভক্তিশাস্ত্রকে বৈষ্ণবের বেদ বলিয়া আশ্রয় করিলেন। ধর্ম্মের

রামানুজ

দৃষ্টিতে বিষ্ণুভক্ত সবাই সমান, অথচ সমাজে জাতিভেদ আছে, কাজেই উভয় কুল রক্ষা করিয়া ব্যবস্থা হইল—প্রত্যেকে পৃথক্ খাইবে। পংক্তিভোজন করিতে গেলেইতো উচ্চনীচ-বিচার আসে। ইহাই হইল তেন্‌কলই ( Ten Kalai ) বা দক্ষিণ-বাদ। ইহা কিছু বেশী স্বাধীনতা মনে করিয়া পঞ্চদশ ষোড়শ শতাব্দীতে বেদান্ত-দেশিক অনেক পরিমাণে বেদবাদ ও প্রাচীন রীতি পুনঃ প্রবর্ত্তিত করেন, তাহাই হইল বেদ্ কলই (Ved Kalai) বা বেদ-বাদ। তেন্ কলই মতবাদীরা বিবাহে বৈদিক হোম বাদ দিয়াছিলেন, বিধবার মস্তকমুণ্ডন বাদ দিয়াছিলেন, বেদান্ত-দেশিক সেগুলি পুনঃ প্রবর্ত্তিত করিলেন।

লক্ষ্মীর উপদিষ্ট বলিয়া রামানুজ-মতকে শ্রী-সম্প্রদায় বলা হয়। ইহাতে বেদান্তের অদ্বৈতভাবের প্রভাব আছে বলিয়া ইঁহাদের মতকে বিশিষ্টাদ্বৈত-মতও বলে। রামানুজ ও তাঁর মতবাদীদের সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, কাজেই বেশী কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। রামানন্দ পূর্ব্বে এই রামানুজ-সম্প্রদায়ী ছিলেন, পরে এই সম্প্রদায়ের বন্ধন হইতে মুক্ত হন। তিনি মধ্যযুগের একজন যুগগুরু। তাঁর কথা পরে বলা হইবে।

মাধ্ব

আনন্দতীর্থ ( ১৩৩১ খ্রীঃ ) পূর্ব্বে শৈব শঙ্কর-মতবাদী ছিলেন। পরে বৈষ্ণব হইয়া দ্বৈতমতের মাধ্ব সম্প্রদায় স্থাপন করেন। তাঁর সম্প্রদায়কে ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ও বলে। তিনি চতুর্দ্দশ শতাব্দীর লোক। বেদান্তবাদকে পরিহার করিয়া ইনি সাংখ্যযোগের পথে সাধনায় অগ্রসর হইতে চাহেন।

বিষ্ণু স্বামী

বিষ্ণু স্বামীর সম্প্রদায়কে রুদ্র-সম্প্রদায় বলে। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইনি বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করেন। শিব বা রুদ্র ভাষিত বৈষ্ণবমতই তিনি প্রচার করেন। গুজরাতে তাঁর মতবাদী লোক বেশী। তাঁর বংশের লক্ষ্মণ ভট্ট উত্তর-ভারতে চলিয়া যান। সেখানে তাঁর পুত্র বল্লভ বিখ্যাত পুষ্টিমার্গ বা বল্লভাচার্য্য মত স্থাপন করেন। ইঁহারা ঈশ্বরকে সচ্চিদানন্দস্বরূপ বলেন। ইঁহাদের মতকে শুদ্ধাদ্বৈতবাদ বলে। নামদেবের শিষ্যেরা বলেন, বিষ্ণু স্বামী নাকি ভক্ত নামদেবের কাছে ভক্তির উপদেশ পাইয়াছিলেন। কাল হিসাবে তাহা অসম্ভব নয়। শ্রী-সম্প্রদায় প্রভৃতি বিশিষ্ট সম্প্রদায়েও দেখা যায়, বড় বড় আচার্য্যরা তাঁহাদের আদি অনুপ্রেরণা পাইয়াছেন আলবার প্রভৃতি নিরক্ষর জাতি-কুলহীন সাধকদের কাছে।

নিম্বার্ক

নিম্বাদিত্যের সম্প্রদায়ের নাম সনকাদি-সম্প্রদায় বা দ্বৈতাদ্বৈত-সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়-গুরু সূর্য্যের অবতার। ইঁহারা সকলের অপেক্ষা পুরাতন মত-বাদী।

চৈতন্য

চৈতন্য মতকে গৌড়ীয় মাধ্ব-মতও বলে। মাধ্ব-মতের একটি স্রোত বাংলা দেশে পৌঁছিয়া মহাপ্রভুকে নূতন জীবন দিল। যদিও চৈতন্যের পূর্ব্বে বাংলায় ঈশ্বরপুরী, কেশব ভারতী প্রভৃতি ছিলেন, তবু মহাপ্রভু চৈতন্যই বাংলা দেশে নূতন ভক্তিধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিলেন। তিনি ধর্ম্মে মুসলমান ও হিন্দুর সকল জাতিকে গ্রহণ করিলেন বটে কিন্তু সামাজিকভাবে সকলকে সমান অধিকার দিতে পারিলেন

না, সে হিসাবে জাতিভেদ রহিল। নারীদের অধিকারও তিনি সাবধানে কতকটা দিয়াছিলেন। তাঁহার জন্ম ১৪৮৪, মৃত্যু ১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে। চৈতন্যের পূর্ব্বে বাংলায় জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি সহজ বৈষ্ণবমতের লেখকদের প্রভাব ছিল। সহজমতের নিত্যানন্দ প্রভৃতির সঙ্গে মিলিত হওয়ায় মহাপ্রভুর ধর্ম্ম সহজে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, রায় রামানন্দ, শ্রীনিবাস, জীব গোস্বামী, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি লেখকেরা তাঁর মতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্রের শাখা পরে বাউলদের সঙ্গে মিলিত হয়। মহাপ্রভুর মতবাদ তাঁর সঙ্গে উড়িষ্যায় যায়, বৃন্দাবনেও তাঁর অনুবর্ত্তীদের সঙ্গে যায়।

মাজুলি

আসাম মাজুলির চারিধামের গোঁসাইরাও বাংলার ভাবই প্রচার করিয়াছেন।

আসামের শঙ্কর দেবের মহাপুরুষিয়া-মত আরও একটু উদার।

শঙ্কর দেব

তার কারণ শঙ্কর দেব নিজে কায়স্থ ছিলেন। সামাজিক দৃষ্টি তাঁর অনেকটা উদার ছিল। তাঁর নাগা মিকির ও মুসলমান শিষ্য ছিল। দেব-দেবী পূজা, মন্দিরে গমন, প্রসাদ ভোজন তাঁর মতে মিথ্যাচার। ইঁহাদের মধ্যে শূদ্রেরও ব্রাহ্মণ শিষ্য আছে।

বৃন্দাবন হইতে মহাপ্রভুর ধর্ম্ম ভারতে অনেক দূরে ছড়ায়, বৃন্দাবনের তাৎকালিক সকল বৈষ্ণব-আন্দোলনে গৌড়ীয় ভাবের প্রভাব দেখা যায়। তাহা ছাড়া রাজপুতানার বৈষ্ণবদের উপরও চৈতন্য-মতের বেশ প্রভাব লক্ষিত হয়। সূরত জেলায় বলসার প্রভৃতি স্থানের বাণিয়াদের মধ্যে ও সুদূর পঞ্জাবে ডেরা-ইস্‌মাইল-খাঁ-বাসীদের মধ্যেও গৌড়ীয় ভাবের বৈষ্ণব দেখিয়াছি। তাঁহারা

বৃন্দাবন ও নবদ্বীপকে মহাতীর্থ মনে করেন। তাঁহারা ভক্তিভাবে দু'একটি গৌড়ীয় পদ-কীর্ত্তনও করেন।

বল্লভাচার্য্যের মতকে পুষ্টিমার্গও বলে। গুজরাত ও কচ্ছেই ইহার বেশী প্রচার। দক্ষিণ-ভারত হইতে বিষ্ণুস্বামিবংশীয় লক্ষ্মণ ভট্ট উত্তরে আসেন। বল্লভ তাঁরই পুত্র। কাশীতে ১৪৭৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জন্ম। ইঁহারা রাজসিক ভাবে রাধাকৃষ্ণ ভগবানের পূজা ও সেবা করেন।

বল্লভ

ইঁহার পুত্র বিট্‌ঠল গদ্যরচনার সুলেখক ছিলেন। বল্লভের চারি শিষ্য ও বিট্‌ঠলের চারি শিষ্য, এই আটজন কৃষ্ণভক্তির প্রচারক কবি ছিলেন। ইঁহাদিগকে অষ্টছাপ বলে। বিখ্যাত অন্ধ কবি সূরদাস এই বল্লভের চারি শিষ্যের একজন ছিলেন। তাঁর ছয় ভাই মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধে মারা যান। ইনি অন্ধ বলিয়া যুদ্ধ করিতে অক্ষম ছিলেন, পরে ভক্ত কবি হন। কেহ কেহ বলেন ইঁহার পিতা বাবা রামদাস আকবরের সভায় গায়ক ছিলেন।

অষ্টছাপ

সূরদাস

সৈয়দ ইব্রাহিম (১৬১৪ খ্রীঃ জীবিত) বৈষ্ণবভাবে ও পদাবলীতে মুগ্ধ হইয়া বৈষ্ণব হন এবং ভক্তিতে ভরপূর পদাবলী রচনা করেন। তাঁর তখন নাম হয় রসখান। তাঁর শিষ্য কাদির বক্‌স্‌ও ভক্তির কবিতায় হৃদয়ের প্রেমভাব প্রকাশ করিয়াছেন। বল্লভ-সম্প্রদায়ের বৃন্দাবন-বাসী ব্রজবাসী দাসের ব্রজবিলাস (১৭৭০) কৃষ্ণভক্তির একটি বিখ্যাত গ্রন্থ।

রসখান

কাদির বক্‌স্‌

ব্রজবাসী দাস

বল্লভ-সম্প্রদায়ে নানাবিধ বিকার ও ব্যভিচার প্রবেশ করিল। তাহারই প্রতিবাদ-স্বরূপে ১৭৩০ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীতে চরণদাস তাঁর সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন করেন। তাঁহার মতামত অনেকটা কবীরের মতানুযায়ী। দারা শিকোহের ভাবেও তিনি কতকটা অনুপ্রাণিত ছিলেন।

চরণদাস

১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে অযোধ্যা গোণ্ডা জেলায় ছপৈয়া বা ছিপিয়া গ্রামে সহজানন্দের জন্ম হয়। এক চামারের কাছে কিছু উপদেশ পাইয়া সহজানন্দ ধর্ম্মের সরল সহজ রূপ উপলব্ধি করেন এবং বিশুদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হন। তিনি বল্লভের সম্প্রদায়ের সব ব্যভিচার দূর করিয়া স্বামী নারায়ণী-সম্প্রদায় স্থাপন করেন। ইহার প্রধান স্থান গুজরাত বড়তালে কাঠিয়াওয়াড় গঢ়ড়ায় ও মূলীতে। ইহাতে নিম্নবর্ণেরও সাধনার অধিকার আছে। ইহাতে মুসলমানও গৃহীত হইয়াছে। গঢ়ড়ায় এখনো ২৫০ ঘর খোজা মুসলমান এই ধর্ম্মে আছে। গুজরাত বড়তালের মঠ ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত।

স্বামী নারায়ণী

সনকাদি সম্প্রদায় হইতে রাধাবল্লভী সম্প্রদায়ের উদ্ভব। তান্ত্রিকদের মত তাঁহারা শক্তিকে পুরুষ অপেক্ষা বড় মনে করেন। তাই তাঁহাদের রাধা আগে, কৃষ্ণ পরে। ভক্ত হিত-হরিবংশ বৃন্দাবনে ১৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দে এই সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন করেন। বাংলা দেশেও তান্ত্রিকতার সঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম্ম মিশিয়া গিয়া নানাবিধ মতবাদের উদ্ভব হয়। তান্ত্রিক বৈষ্ণবেরা চণ্ডীদাস, নিত্যানন্দ, ও

রাধাবল্লভী

বীরভদ্রাদির নাম যতটা করেন, মহাপ্রভু চৈতন্যের নাম ততটা করেন না। সেই সব তান্ত্রিকতার প্রভাব রাধাবল্লভী মতবাদের উপর থাকিতে পারে। মহাপ্রভুকে বরং অনেকটা এই সব সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিলিয়া কাজ করিতে হইয়াছে। এই সম্প্রদায়ের কবি নাগরীদাসকে অনেকে গৌড়ীয় চৈতন্য সম্প্রদায়ী মনে করেন।

হরিদাসী

বাংলা দেশের প্রভাবে বৃন্দাবনে ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে হরিদাসী সম্প্রদায়ের উদ্‌ভব হয়। ইহাতে গৌড়ীয় ভাবের প্রাধান্যই লক্ষিত হয়। এই সম্প্রদায়ে বিট্‌ঠল বিপুল, বিহারিণী দাস, সহচরীশরণ (১৭৬০) প্রভৃতি নেতা জন্ম-গ্রহণ করেন। হরিদাসী মঠের টট্টী সম্প্রদায়ের বিখ্যাত কবি শীতল স্বামীর জন্ম হয় ১৭২৩ খ্রীষ্টাব্দে।

মীরা বাঈ

মীরা বাঈ যদিও রবিদাসের শিষ্য বলিয়াই খ্যাত তবু বৃন্দাবনের জীব গোস্বামীর সঙ্গে তাঁর দেখা হওয়ার কথা আছে। অনেকে মনে করেন তাঁর উপর গৌড়ীয় মতের প্রভাব কতক পরিমাণে ছিল। একথা বিচার-সাপেক্ষ। এখানে স্থানাভাব, কাজেই উল্লেখ মাত্র করিয়া কথাটা রাখিয়া দিলাম।

তুকারাম

মহারাষ্ট্রের তুকারামের নাম এখানে করা উচিত। তিনি শাস্ত্র ও সংস্কৃত ছাড়িয়া ভাষায় সহজভাবে প্রেম ও সুনীতি সকলের হৃদয়ে প্রচার করিয়াছেন। কেহ বলেন, তিনি ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে জন্ম-গ্রহণ করেন, কাহারও মতে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে। তিনি শূদ্র। তাঁর পিতা শস্য বিক্রয় করিতেন। পাণ্‌ঢরপুরের

বিঠোবার তিনি ভক্ত। কেহ কেহ বলেন বাংলার চৈতন্য প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের সহিত তাঁহার যোগ ছিল। কারণ তাঁর গুরু কেশবচৈতন্য বা বাবাজিচৈতন্য। নামদেবের প্রভাব তাঁহাতে প্রভূত পরিমাণে লক্ষিত হয়। তাঁহার রচিত "অভঙ্গ" সে দেশের ভক্তদের মুখে মুখে।

নামদেব

মহারাষ্ট্রে নামদেবেরও খুব প্রভাব। তিনি জাতিতে ছিলেন দরজী। পাণ্ঢরপুরে তাঁর স্থান। সাধারণ মতে ১৪০০-১৪৩০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর সময়। এই ধর্ম্মের প্রভাব মহারাষ্ট্র হইতে পাঞ্জাবে যায়, পাঞ্জাব বাটালার নিকট ঘোমান গ্রামে তাঁহাদের মঠ দেখিয়াছি।

পঞ্জাবের ঘোমান মঠের মত অনুসারে নামদেবের জন্ম ১৩৬৩ খ্রীষ্টাব্দে। বোম্বাই সাতারার নরসি-বাহ্মনি গ্রামে তাঁর জন্ম। তাঁর গুরু মহারাষ্ট্রের লোকবিশ্রুত গুরু জ্ঞানেশ্বর। নামদেব বিবাহিত গৃহস্থ ছিলেন। ৫০ বৎসর বয়সে সংসার ত্যাগ করিয়া ভারতের নানাস্থানে ভ্রমণ করেন ও সাধকদের সঙ্গে পরিচিত হন। হরিদ্বারে তাঁহার মন বসিল না। শেষে ঘোমানে গিয়া বাস করিলেন। ফিরোজ শাহ তোগলকের (১৩৫৫-১৩৮৮ খ্রীঃ) সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে। সৈয়দ বংশের শেষ রাজা শাহ আলম্ ১৪৪৬ খ্রীষ্টাব্দে নামদেবকে মঠের জন্য ভূমি বৃত্তি দেন; জলাশয় খনন করাইয়া দেন, এবং মঠটি তৈয়ার করাইয়া দেন। ১৪৬৪ খ্রীষ্টাব্দে নামদেব এখানেই দেহত্যাগ করেন। নামদেবীয়দের মতে বিখ্যাত বৈষ্ণবাচার্য্য বিষ্ণুস্বামী তাঁর শিষ্য। বিষ্ণুস্বামী, কেশবদাস, বোহরদাস, জল্লো, লড্ডা প্রভৃতি ভক্ত তাঁর সমাধি-মন্দির তৈয়ার করাইয়া দেন। বোহর-

দাসের বংশীয়রাই এখন ঘোমানে মঠের সেবক ও আচার্য্য। গুরুদাসপুর জেলায় বাবা নামদেবী সম্প্রদায়ে অনেকেই বোহরদাসের বংশীয়। মন্দিরের আয়ে দরিদ্রদের সেবা করা হয়। মঠে নামদেবের বাণী বলিয়া একখানি ২ শত বৎসরের হস্তলিখিত পুঁথি আছে। পুঁথিখানির ২৯টি পৃষ্ঠা। ভাষা মহারাষ্ট্রী গন্ধযুক্ত হিন্দী। এই মঠে গ্রন্থ-সাহেবেরও আদর আছে। শিখ্‌দের মত ইহারা কৃপাণকে পবিত্র মনে করেন না ও মন্দিরে কৃপাণ স্পর্শ করেন না। নামদেবের জন্মতিথি শ্রীপঞ্চমীতে; মাঘের ১লা, ২রা তারিখে ও জন্মাষ্টমীতে ঘোমানে নামদেবের স্থানে মেলা হয়। মাঘমাসের মেলায় সেখানে বহুলোক সমবেত হয়।

[গ্রন্থ-সাহেবে নামদেবের পদ গৃহীত হইয়াছে।] এই দর্জ্জি নামদেব ছাড়া এক ছিপি বা বস্ত্রছাপ-দেওয়া ব্যবসায়ী নামদেব ভক্ত আছেন, তাঁর স্থান বুলন্দ সহরে। মারবারে আর এক নামদেব হইয়া গিয়াছেন। তিনি ছিলেন জাতিতে তুলাধুনকর। এঁরা সবাই ভক্ত ও অনেক ভক্ত সাধক ইঁহাদের অনুরাগী।

রামদাস—শিরজি

মহারাষ্ট্র ভক্তদের নাম আরও অনেক আছে। সব এখানে দেওয়া সম্ভব নয়। তবু শিরজির গুরু সমর্থ রামদাস স্বামীর নাম না করিলে অন্যায় হইবে। শিরজিকে সহায় রূপে পাইয়া হিন্দু আদর্শ পুনঃ স্থাপনের একটা বড় সুযোগ রামদাস পাইলেন। হিন্দুধর্ম্মের জন্য গৃহীতব্রত হইলেও মুসলমান ধর্ম্মের প্রতি শিরজির যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল, মুসলমান সাধকদের প্রতি ও মুসলমান

সাধনা স্থানের প্রতি তাঁর কর্ত্তব্য কখনো তিনি অসম্পূর্ণ রাখেন নাই।

গুজরাতের নরসী মেহেতার কথা এতক্ষণ বলা হয় নাই। জুনাগড়ে ১৪১৩ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম ও ১৪৭৬ খ্রীঃ মৃত্যু। ইঁহার চমৎকার প্রেম ভক্তি পদে গুজরাত সৌরাষ্ট্র কচ্ছের ভক্তদের হৃদয় সরস হইয়া আছে। নাগর ব্রাহ্মণ বংশে ইঁহার জন্ম।

নরসী মেহেতা

ইহা ছাড়া গুজরাতের কয়েকজন ভক্তের কথা এখানে বলা উচিত। আখো ভগত (১৬১৩-১৬৬৩ খ্রীঃ) জাতিতে ছিলেন স্বর্ণকার। আমেদাবাদে তাঁর স্থান। পূর্ব্বে বৈষ্ণব ছিলেন পরে বেদান্তী হন। ইঁহার রচিত বহু পদ আছে।

আখো

নিষ্কুলানন্দ ছিলেন কাঠিয়াওয়াড় গড়ড়াবাসী। ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জন্ম। জাতিতে তিনি ছুতার। স্বামী নারায়ণ-সম্প্রদায়ে সাধনা লাভ করিয়া উত্তম পদ রচনা করেন।

নিষ্কুলানন্দ

মুক্তানন্দ স্বামী নারায়ণী। ইনি সহজানন্দের শিষ্য। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম-গ্রহণ করেন। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর গড়ড়ায় মৃত্যু। ভক্ত দয়ারাম বড়োদার অন্তর্গত দাভোই নগরে ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম-গ্রহণ করেন; ১৮৫১ খ্রীঃ মারা যান।

মুক্তানন্দ, দয়ারাম

ভক্ত প্রীতম্ দাস গুজরাত চরোতর সংদেশর গ্রামে ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন।

প্রীতম্ দাস

ভোজো ভগত কাঠিয়াওয়াড় জেতপুরের নিকট দেবকীগালোড়

ভোজো

গ্রামে ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে জন্মিয়া ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন।

ব্রহ্মানন্দ জাতিতে বারোট। ডুংগরপুর পরগনায় সাণ

ব্রহ্মানন্দ

গ্রামের অধিবাসী; ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। স্বামী নারায়ণ-সম্প্রদায়ে সাধনা করেন।

ধীরো ভগত বড়োদার কাছে সাবলী গ্রামবাসী। ১৮২৩

ধীরো

খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন।

বাপু ভকত মীয়াঁগ্রামবাসী ধীরো ভগতের শিষ্য। ১৮৪২

বাপু

খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু। ইঁহাদের রচিত পদ গুজরাত কাঠিওয়াড়ের ভক্তদের হৃদয়ে প্রেমভক্তি জাগ্রত রাখিতেছে।

ব্রহ্মানন্দ, দেবানন্দ প্রভৃতি স্বামীনারায়ণী-সম্প্রদায়ের সাধুরা মুসলমান, চামার প্রভৃতি অন্ত্যজ জাতিকে সাধনা দিয়াছেন। ইঁহাদের কৃপায় দীনহীনদের ঘরে ভগবদ্‌ভক্তি ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

ইহা ছাড়া গুজরাতের আরও যে কয়জন সমর্থ উপদেষ্টা সাধকের নাম করা উচিত তাঁহাদের উল্লেখ করা যাউক ঃ—

সন্তরাম সাধক, ইঁহার স্থান নদীয়াদে। শাখা উমরেঠ ও

সন্তরাম

পাদরায় আছে। ইঁহারা অপৌত্তলিক। মুসলমানও ইঁহাদের মধ্যে সাধনা গ্রহণ করিতে পারেন।

মাধবগর ভক্ত ১৮২৪ সালের কাছাকাছি নদীয়াদে ছিলেন। ইনি সম্প্রদায় মানিতেন না। নামরূপ-হীন ব্রহ্মস্বরূপ উপদেশ করিয়াছেন। ইনি আচার সংস্কার মুক্ত। সুনীতি ও সদাচার-বিনা সাধনা চলে না এই তাঁর মত ছিল।

মাধবগর

লক্ষ্মণগরের উপদিষ্ট ভক্তিমার্গের সাধকও গুজরাতে আছেন। কুবের নামে কোলি জাতীয় একজন ভক্ত অল্প দিন পূর্ব্বে ছিলেন। সারসা গ্রামে তাঁর বাড়ী। কুবেরের ভক্তিগুণে বহু উচ্চশ্রেণীর লোক তাঁর উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া সাধনা করিয়াছেন।

লক্ষ্মণগর, কুবের

রণছোড় দাস ভগত নামে এক বাণিয়া এক ভক্তি পন্থের উপদেশ করেন। ১৭২৪ খৃষ্টাব্দে তিনি জীবিত ছিলেন।

রণছোড় দাস

রাম ও কৃষ্ণকে পূর্ণ আদর্শরূপে ধরিয়া যাঁহারা ভারতীয় ধর্ম্মকে শক্তিশালী ও পূর্ণাঙ্গ করিতে চাহিলেন, তাঁহাদের মধ্যে সকলের আগে নাম করিতে হয়, ভক্ত তুলসীদাসের। তাঁর রামায়ণ উত্তর-ভারতের কত ভক্তের হৃদয়কে আজও পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে তাহা বলিয়া বুঝান যায় না। বান্দা জেলার রাজপুরে কনৌজী ব্রাহ্মণ বংশে ১৫৩২ খ্রীঃ তাঁর জন্ম। রামানন্দের সম্প্রদায়ে তিনি ভক্তি দীক্ষা গ্রহণ করেন। রামানন্দ হইতে তিনি ষষ্ঠপীঢ়ীতে। তাঁহার রামচরিতমানসকে অনেকে বাল্মীকি-রামায়ণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ মনে করেন। ভক্তিরসে পবিত্রতায় এই গ্রন্থ ভরপূর। তাঁহার বিনয় পত্রিকার প্রার্থনামালা ভক্তদের অমূল্য ধন।

তুলসীদাস

বাংলা দেশের কৃত্তিবাস ও মহাভারতকার কাশীদাসের কথা এখানে বলা নিষ্প্রয়োজন। বাংলার ঘরে ঘরে ইঁহারাই প্রাণ দিয়াছেন।

কৃত্তিবাস, কাশীদাস

তবে একথা হয় তো অনেকে জানিতে না পারেন যে, মধ্য ভারতের রায়পুর ও বিলাসপুর জেলা পর্য্যন্ত হিন্দুস্থানী কৃষকের ঘরে বাংলা অক্ষরে কাশীদাসী মহাভারত দেখিয়াছি। ভাষা ভাল করিয়া বুঝেন না তবু তুলসীরামায়ণের মত কাশীদাসের মহাভারতখানিও রোজ সযত্নে একটু একটু পড়েন।

ভারতের সকল ভাষায়ই রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি পুরাণ-কারেরা প্রভূত উপকার করিয়া গিয়াছেন। কাশীরামদাসের কৃপায় মহাভারত বাংলার

যাত্রা কীর্ত্তন মেলাদি

যেরূপ প্রতিজনের সুবিদিত এমন আর ভারতের কোথাও নহে। যাত্রা, কথকতা, রামলীলা প্রভৃতি উৎসব, মেলা, তীর্থযাত্রা, ভজন কীর্ত্তন সঙ্কীর্ত্তন সৎসঙ্গাদি এ ক্ষেত্রে প্রভূত সহায়তা করিয়াছে।

শৈব ভক্তদের বিষয় এ পর্য্যন্ত কিছুই বলা হয় নাই। কাশ্মীরে ও হিমালয় প্রদেশে যদিও নকুলীশ পাশুপত বা শৈব শাস্ত্র পণ্ডিত-

শৈব কাশ্মীর

দের মধ্যে প্রচলিত ছিল, কিন্তু প্রকৃত শৈব ভক্ত দেখা যায় দক্ষিণে। কাশ্মীরে একাদশ শতাব্দীর অভিনবগুপ্তের উপদিষ্ট শৈবদর্শন ও প্রত্যভিজ্ঞা শাস্ত্রাদির কথা বলার অবসর এখানে নাই। ইঁহার পূর্ব্বেও সিদ্ধ সোমানন্দ প্রভৃতি গুরু ছিলেন। উৎপলাচার্য্য লিখিত গ্রন্থ প্রভৃতি শুধু পণ্ডিতেরাই পড়িবেন। ভক্তদের জন্য ভক্ত শৈবদের বাণী আছে।

দক্ষিণেও সুপ্রভেদ আগম, স্বায়ম্ভুব আগম, বীর শৈবদের বীরাগম প্রভৃতি প্রচলিত ছিল। চন্ন-বসব পুরাণে নূতন পুরাতন অনেক শিব ভক্তের নাম পাওয়া যায়। কি সঙ্গমেশ্বর শিষ্য মায়িদেবের গ্রন্থ, কি সিদ্ধান্ত-শিখামণি, কি অষ্টাবিংশতি শৈবাগম, কি উৎপলাচার্য্য বা মারিতোণ্টদার্য্যের গ্রন্থ সবই পণ্ডিতদের পঠনীয়, মূর্খ ভক্তরা তার কি জানে? ময়কোণ্ডদেব (Meykondadeva) লিখিত "শৈবজ্ঞান-বোধ" গ্রন্থে দেখা যায় (১৩শ শতাব্দী, ১২২৩ খ্রীঃ) প্রায় সব ভক্তই অব্রাহ্মণ। ময়াকাণ্ডদেব সাধারণের মধ্যে শিবভক্তি প্রচার করেন। পরে 'মরাই জ্ঞান সম্বন্ধ' (Marai Jnana Sambandha) কর্ত্তৃক "শৈব সময় নেরী" রচিত হয়। উমাপতি শিবাচার্য্য চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথমেই "শিব প্রকাশ" রচনা করেন। পত্তিরাগিরিয়ার, শিববাক্য, পত্তিনাত্তু পিল্লে, পরণযোধি মুনিয়র, অঘোর শিবাচার্য্য, শিবযাগিন্‌ প্রভৃতি সবাই অব্রাহ্মণ, ইঁহারা সবাই ব্রাহ্মণ-বিরোধী ও শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট আচার-বিরোধী, প্রতিমার বিরোধী। ইঁহারা বলেন "কোন আচার বা নিয়মকে ধর্ম্ম বলা চলে না। ধর্ম্ম হইল অন্তরের অনুভবের বস্তু। প্রতিমায় দেববুদ্ধি অতি সঙ্কীর্ণ মতি।" শিববাক্য (১৭ শতাব্দী) বলেন—"এই সব কৃত্রিম দেবতা, যাহাদের অস্তিত্ব অনস্তিত্ব, পূজা অপূজাও মানুষের আয়ত্ত, তাহারা কি করিতে পারে? তাহারা কেমন করিয়া মুক্তি দিবে? পাষাণে ফুল সাজাইয়া কি ফল? ঘণ্টাবাদনে, বিধিবদ্ধ নিয়মে, প্রদক্ষিণে,

শৈব দক্ষিণ

ময়কোণ্ডদেব

শিববাক্য

ধূপে পূজোপচারে কি ফল? যোগীর ৯৬ নিয়মে কি ফল? কায়াকর্ষণে, মন্ত্রে, তীর্থে, গঙ্গাস্নানে কি ফল? মায়া ত্যাগ কর, চিত্ত শান্ত কর, তোমার হৃদয়ে কাশী তরঙ্গিত হইবে। মৃন্ময় প্রতিমা নহে চিন্ময় ঈশ্বরই আরাধ্য।"

পত্তিরাগিরিয়ার

পত্তিরাগিরিয়ার (১০ম শতাব্দী) অতি কাতরভাবে ভগবানকে নিবেদন করিতেছেন—"কবে ইন্দ্রিয় দান্ত হইবে, গর্ব্ব নত হইবে, ক্লান্তি সুষুপ্তিতে শান্ত হইবে?" "লিখিত শাস্ত্রে কি ঈশ্বরানুভব হয়? বহু পাঠেও ভক্তিজ্ঞান হয় কি? কবে শাস্ত্র দগ্ধ করিয়া, বেদ অগ্রাহ্য করিয়া, মর্ম্ম উদ্‌ঘাটন করিয়া পরমানন্দ লাভ করিব? কবে বদ্ধ মীন মুক্ত হইবে? নত নেত্রে ভগবানের চরণতলে গিয়া তাঁর ভাবে কবে নিজ ভাব বিলীন করিব?"

পত্তিনাত্তু পিল্লে

পত্তিনাত্তু পিল্লে বলেন—"হাতে গড়া, পাষাণে বা তেঁতুলে-মাজা তাম্রমূর্ত্তিতে ঈশ্বর নাই। তাঁহাকে অন্বেষণ কর হৃদয়-গুহায়, সাধকের হৃদয়-স্বর্গে, মানবপ্রেমে।"

ভক্ত-পরিচয়-শাস্ত্র

ভারতের নানাভাগের নানামতের ভক্তদের পরিচয় কোনো একখানা গ্রন্থে পাওয়া কঠিন।

বিট্‌ঠলের পুত্র গোকুলনাথ (১৫৬৮ খ্রীঃ) চৌরাশী বার্ত্তা নামে এক গ্রন্থ লেখেন। তাহাতে ভক্তজীবনী অপেক্ষা গল্পই

ভক্তমাল

বেশী। তারপরেই নাভার ভক্তমাল। ইনি ১৬০০তে ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। ইনি জাতিতে ডোম। বল্লভাচার্য্য-সম্প্রদায়ের অগ্রদাস ইঁহাকে পাইয়া অনাথ শিশু দেখিয়া পালন করেন। ভক্ত অগ্রদাস ও

কীল্‌হের কথা বৈষ্ণবমাত্রেরই বিদিত। কোনো কোনো মতে নাভা রামানন্দ-সম্প্রদায়ী ছিলেন। তাই হয়তো রামভক্তদের কথা তিনি বেশী লিখিয়াছেন। পরে প্রিয়াদাস যে টীকা করেন তাহাতে তিনি অনেক কৃষ্ণভক্তের বিষয় লিখিয়াছেন, কারণ তিনি কৃষ্ণপন্থী মাধ্ব-প্রবর্ত্তিত ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ের লোক।

ভক্তমালে ১৬০ জনের উপর ভক্তের চরিত আছে। তার মধ্যে কতক পৌরাণিক। তবু ১৪০ জনের উপর ঐতিহাসিক যুগের ভক্তদের চরিত আছে। যাঁহারা শাস্ত্র মানিয়া চলেন নাই বা সম্প্রদায়ী নহেন এমন অনেক ভক্তের নাম তিনি বড় একটা দেন নাই। রবিদাস ও কবীর নীচজাতি এবং স্বাধীন-মতবাদী হইলেও রামানন্দের নিজ শিষ্য বলিয়া তাঁহাদের বাদ দেওয়া অসম্ভব। কিন্তু ভক্তমালে দাদূ, নানক, রজ্জব প্রভৃতি বড় বড় ভক্তের নাম নাই। কারণ তাঁহাদিগকে কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মসাৎ করিয়া লওয়া সহজ নহে। দক্ষিণের শৈব ভক্তদের নাম বোধ হয় ইঁহারা তেমন জানিতেন না। তবু সৌভাগ্যের কথা এই যে, নাভা-রচিত ভক্তমাল ছাড়া আরও ভক্তমাল আছে, এবং নানা মঠে ও সম্প্রদায়সংগ্রহ-গ্রন্থে যে সব ভক্তদের চরিত রক্ষিত আছে, তাহা সযত্নে সংগ্রহ করিলে ভারতের মধ্যযুগের সাধকদের চমৎকার ইতিহাস রচিত হইতে পারে।

ভক্তমালে যে সব শাস্ত্র বা আচারবাদী ভক্তের কথা লেখা হইয়াছে, তাহাদের নাম আর এখানে করিলাম না। ভক্তমাল খুবই চলিত গ্রন্থ। যে কেহ তাহা দেখিয়া লইতে পারেন। পারসী ভাষায় রচিতও কিছু কিছু উপাদান আছে। দবীস্তান পুস্তক হইতেই উইল্‌সন সাহেব তাঁহার ভারতীয় ধর্ম্ম সম্বন্ধে

বিখ্যাত পুস্তকখানি লিখিয়াছেন। তামিল ভক্তদের সম্বন্ধেও অনেক গ্রন্থ আছে। এই বক্তৃতাতেই দুই এক খানি পুস্তকের নাম করা হইয়াছে। সেরূপ পুস্তক আরও আছে। ভবিষ্যৎ যুবক সত্যান্বেষীরা এই সব উপকরণ সংগ্রহ করিয়া ভারতীয় সাধনার পরিচয় দিবার কাজ পূর্ণ করিবেন এই আশা মনে রাখি।

মুসলমান ও হিন্দু এই কয়জনের কথা বলিয়া আজিকার বক্তব্য সমাপ্ত করিব। ইহার শেষদিকে দুই এক জন হিন্দু শাস্ত্র না-মানা ভক্তের নামও আসিয়া পড়িয়াছে। তবু প্রধানতঃ তাঁদের কথাই বলা গেল যাঁহারা শাস্ত্র ও নিয়ম মানিয়া চলিয়াছেন, যাঁহারা প্রচলিত সামাজিক চিহ্ন ও আচার মানেন। তাই তাঁদের পণ্ডিতেরা বলেন ব্যক্তলিঙ্গাচার। বে-শরা, বে-ডুরী বা অব্যক্তলিঙ্গাচারদের কথা কাল বলা যাইবে।

( দ্বিতীয় বক্তৃতা )

মধ্যযুগের বন্ধনহীন বা বে-শরা মতবাদ সকলের ইতিহাস খুঁজিতে গেলেও মধ্যযুগের অনেক আগে যাইতে হয়। বাউলরা বলেন, সব কৃত্রিম ধর্ম্মেরই আদি আছে; সহজ মুক্ত ধর্ম্ম চিরকালের। দাদূর শিষ্য সুন্দরদাস তাঁর সহজানন্দ গ্রন্থে এই কথাই বলিয়াছেন। বাউলরা বলেন তাঁদের এই সহজধর্ম্ম বেদেরও আগের। অথর্বের ব্রাত্যরাও তখনকার দিনের বাউল। যাক্, সে তো বহু আগের কথা।

সহজ নিত্যকালের

কবীর, দাদূ, সুন্দরদাস, রজ্জব প্রভৃতি সকল সাধকই সেই নিত্যকালের সহজের কথা বলিয়াছেন।

সহজ

বাঙ্‌লা, নেপাল ও উত্তরপূর্ব্ব-ভারতে যে নাথপন্থের ও যোগিপন্থের সাধকদের প্রভাব মুসলমানদের বহু পূর্ব্ব হইতে ছিল তাঁহারাও শাস্ত্রাদি হইতে অনেক পরিমাণে স্বাধীন ছিলেন।

নাথ, যোগী

গোরখনাথ, মীননাথ ও সিদ্ধাগণের প্রভাব পরবর্ত্তীকালের ধর্ম্মে কিছু কম হয় নাই। কবীর, নানক প্রভৃতি সাধকদের ধর্ম্মেও এই সব নাথ-পন্থের প্রভাব সুস্পষ্ট। এই পন্থের ময়নামতী ও গোপীচন্দের গান যোগী গায়ক বা ভর্থরীরা ভারতের সকল প্রদেশে ছড়াইয়াছেন। বাঙ্‌লার গোপীচাঁদের গান পাঞ্জাব সীমান্ত-প্রদেশে, সিন্ধুদেশে, কচ্ছে, গুজরাতে, মহারাষ্ট্রে, কর্ণাটেও শুনিয়াছি। এই নাথপন্থ ও যোগীদের ধর্ম্মসম্বন্ধে এখন অনুসন্ধান চলিয়াছে, তাই এখানে আর কিছু বলার প্রয়োজন নাই।

গোপীচন্দ

উত্তরপূর্ব্ব-ভারতের ধর্ম্ম ও নিরঞ্জন-পন্থের প্রভাবও মধ্য-ভারতের মতবাদগুলির উপর যথেষ্ট। ধর্ম্ম ও নিরঞ্জন-পন্থসম্বন্ধে অনেক যোগ্য লোক ইতঃপূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছেন, এখনও আলোচনা চলিতেছে। কাজেই এখানে তাহারও কোনো উল্লেখ করার প্রয়োজন নাই। উড়িষ্যায় নিরঞ্জনপন্থের প্রভাব এখনো আছে এবং সেখান হইতে এই ধর্ম্মমত মধ্যভারত পর্য্যন্ত গিয়া এখনো প্রবল আছে। উত্তর-পশ্চিম পাঞ্জাব রাজপুতানায় এক সময়ে

ধর্ম্ম, নিরঞ্জন-পংথ

এই মতবাদের খুবই প্রচলন ছিল—কবীর প্রভৃতির বাণীতে তাহা বেশ বুঝা যায়। নাথযোগি-মত, নিরঞ্জন-মত এখনো উত্তরপশ্চিমে যোধপুর, কচ্ছ, সিন্ধু প্রভৃতি দেশে বিলক্ষণ আছে। যোগীদের তীর্থ বারপন্থের স্থান ও মঠাদি ভারতের নানা স্থানে দেখিলেই তাহা বুঝা যায়।

রামানন্দ

মধ্যযুগের কথা বলিতে গেলেই প্রথমে বলিতে হয় গুরু রামানন্দের কথা। এই যুগের গুরুই তিনি। আনুমানিক ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৪৭০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যান্ত তাঁর সময়।

রামানুজ দাস হরিবর (১৮৫৭) তাঁর ভক্তমাল-হরিভক্তি-প্রকাশিকায় লিখিয়াছেন যে রামানুজ যাঁহাদের উপদেশে প্রেম ভক্তি পাইলেন তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন বিষ্ণুচিত্ত ও ভক্ত শঠকোপ। শঠকোপ ও বিষ্ণুচিত্ত উভয়ে ছিলেন অতি নীচ-বংশীয়। তবু রামানুজী সম্প্রদায় আচার বিচারের ভারে ভারগ্রস্ত ছিল। হরিবরের মতে রামানন্দ রামানুজ হইতে পঞ্চম শিষ্য। রামানুজী সম্প্রদায়ের রন্ধনে, ভোজনে, জল আনায়, খাওয়ায়, স্পর্শ করায় এত বাঁধাবাধি যে তাঁহাদিগকে আচারী সম্প্রদায় বলে। রামানন্দ ভক্তির ব্যাকুলতায় যখন ভারতবর্ষময় ঘুরিয়া বেড়ান তখন এসব নিয়ম রক্ষা করেন নাই। তাই তাঁহার সম্প্রদায় তাঁহাকে ত্যাগ করে, যদিও সম্প্রদায়ে তাঁর স্থান অতি উচ্চে ছিল। হরিবর বলেন—

"রামানন্দ বুঝিলেন, ভগবানের শরণাগত হইয়া যে ভক্তির পথে আসিল তাহার পক্ষে বর্ণাশ্রম-বন্ধন বৃথা, কাজেই ভগবদ্ভক্ত খাওয়া-দাওয়ায় কেন বাছাবাছি করিবে? ঋষিদের নামেই যদি

গোত্র-পরিবার হইয়া থাকে তবে ঋষিদেরও পূজিত পরমেশ্বর ভগবানের নামে কেন সবার পরিচয় হইবে না? সেই হিসাবে সবাই তো ভাই, সবাই এক জাতি। ভক্তিদ্বারাই শ্রেষ্ঠতা, জন্ম দ্বারা নহে।" ( ভক্তমাল-হরিভক্তি-প্রকাশিকা, পৃঃ ৮১, ৮২ )

রামানন্দ তাঁর কৃত্রিম উচ্চস্থান ছাড়িয়া প্রেম ও ভক্তির সহজ স্থানে নামিয়া আসিলেন এবং জাতি ও ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে ধর্ম্ম উপদেশ দিতে লাগিলেন।

সংস্কৃত ছাড়িয়া তিনি হিন্দীতে উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন; কাজেই ধর্ম্ম আর কেবল পণ্ডিত বা উচ্চ শ্রেণীরই রহিল না। ধর্ম্মের সহজ উৎসবক্ষেত্রে সকলেরই ডাক পড়িল। ইহাই হইল হিন্দী সাহিত্যের সূত্রপাত। রামানন্দের প্রধান দ্বাদশজন শিষ্যের নাম—

(১) রবিদাস—চামার
(২) কবীর—জোলা মুসলমান
(৩) ধন্না—জাঠ
(৪) সেনা—নাপিত
(৫) পীপা—রাজপুত
(৬) ভবানন্দ
(৭) সুখানন্দ
(৮) আশানন্দ
(৯) সুরসুরানন্দ
(১০) পরমানন্দ
(১১) মহানন্দ
(১২) শ্রীআনন্দ

কাজেই দেখিতে পাওয়া যায় এই দলের মধ্যে নানা জাতিরই ভক্ত আছেন। ভক্তরা বলেন শেষের দিকের ভক্তরা রামানন্দের সঙ্গে রামানুজ-সম্প্রদায় হইতে চলিয়া আসেন।

রামানন্দের এই মুখ্য দ্বাদশজন ছাড়া আরো বহু বহু শিষ্য ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে নীচ জাতির সংখ্যাই বেশী। রামানন্দের মতে ভক্তগণ যখন ভগবানের আশ্রয় লেন তখন তাঁদের পূর্ব্ব সব পরিচয় তাঁহাতে লীন হইয়া যায়। তাঁহার ভক্তদের মধ্যে আমরা নারীরও নাম পাই। ভক্তমাল প্রভৃতি গ্রন্থে কবীরের দীক্ষা যে কেমন হঠাৎ রামানন্দের অজ্ঞাতসারে ঘটিয়া গেল তাহা বুঝাইতে গিয়া কত বাজে গল্পেরই অবতারণা হইয়াছে! কিন্তু তাহা মানিয়া লইলেও বাকী শিষ্যদের কথা কি বলা যায়? এই বিষয়ে রবিদাসী প্রভৃতি সম্প্রদায়-গ্রন্থে চমৎকার সব বিবরণ আছে, তাহা এখানে দেওয়া সম্ভবপর নহে। রামানন্দের লিখিত হিন্দী বাণী পাওয়া সহজ নহে। শিখ্‌দের গ্রন্থ-সাহেবে রামানন্দের যে বাণী আছে তাহাতে দেখা যায় তিনি বলিয়াছেন, "কেন আর ভাই মন্দিরে যাইতে আমায় ডাক, তিনি বিশ্বব্যাপী, আমার হৃদয়-মন্দিরেই তাঁর দেখা পাইয়াছি।"

অনেক বৈদেশিক সমালোচক তাঁর এসব বাণী দেখিলেও মানিতে চান না যে, তিনি মূর্ত্তিপূজা ও জাতিভেদের প্রতি আস্থা ত্যাগ করিয়াছিলেন। কারণ তাঁরা বলেন, এখনকার রামানন্দী সম্প্রদায়ে তো সে সব আছে। যুক্তি যদি এমন হয়, তবে দয়ার অবতার ভগবান্ যিশুকেও বলিতে হয় তিনি দয়া ও অহিংসার অবতার ছিলেন না—তিনি সাম্রাজ্যবাদের উপদেষ্টা ও অস্ত্রশস্ত্র-

পরায়ণ হিংসা ও যুদ্ধের গুরু ছিলেন। আজিকার অবস্থা দেখিয়া তখনকার আদর্শের বিচার করা চলে না।

রামানন্দ যদিও প্রচলিত রাম নাম ব্যবহার করিয়াছেন তবু তাঁর ঈশ্বর এক, প্রেমময় নিরঞ্জন। তিনি নির্গুণ ব্রহ্ম নহেন; তিনি মনের মানুষ প্রেমের বন্ধু।

তাঁর মতামত শুধু তাঁর সম্প্রদায়কে নহে, সকল মতামতের লোককেই জাগ্রত করিতে লাগিল। তাই সাধকদের মধ্যে কথা আছে—

"ভক্তি দ্রাবিড় উপজী লায়ে রামানন্দ।
প্রগট কিয়ো কবীরনে সপ্তদ্বীপ নৌখণ্ড।"

ভক্তি উপজিল দ্রাবিড় দেশে, এদেশে আনিলেন রামানন্দ। কবীর তাহা সপ্তদ্বীপ নবখণ্ড পৃথিবীতে প্রকাশ করিয়াছিলেন।

সদন ভক্ত

প্রথমে তাঁর সম্প্রদায়ের বাহিরে সদন ভক্ত ও নামদেবের নাম করিতে চাই। সদন ভক্ত ছিলেন জাতিতে কসাই। ভক্তমালে আছে, তাঁর মাংস বিক্রয় করিবার তুলাদণ্ডে ওজনের জন্যে একটি শালগ্রাম থাকিত। শালগ্রামের এই দুর্গতি দেখিয়া এক সাধু তাহা প্রার্থনা করেন। সদন তৎক্ষণাৎ সাধুকে শিলাটি দেন। রাত্রে সাধু স্বপ্নে দেখেন দেবতা বলিতেছেন আমাকে সেই সদনের বাড়ী রাখিয়া আইস। আমি তাঁর সহজভাবে ভক্তিতে মুগ্ধ। সাধু তাহাই করিলেন।

কেমন করিয়া কাম-ক্রোধ জয় করিয়া দেহ-দুঃখ সহ্য করিয়া সদন ধর্ম্মজীবনে অগ্রসর হন সে কথা ভক্তমালে আছে।

পরিশেষে পুরীধামে জগন্নাথ দেব স্বয়ং তাহাকে আপনার আসনে ডাকিয়া লন। শিখ্‌দের গ্রন্থ-সাহেবে সদনজীর ২টি গান উদ্ধৃত আছে।

সিন্ধুদেশে ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি এক কসাই সদ্‌না ভক্ত বিরাজমান ছিলেন।

নামদেব

নামদেবের কথা পূর্ব্ব বক্তৃতাতেই বলা হইয়াছে। ১৩৬৩ খ্রীষ্টাব্দে মহারাষ্ট্র দেশে দর্‌জী বংশে তাঁর জন্ম। তাঁর রচিত অনেকগুলি ভজন গ্রন্থ-সাহেবে আছে। রামানন্দের মত ইনিও দক্ষিণ দেশ হইতে ভক্তিবাদ উত্তর-ভারতবর্ষে লইয়া যান ও পাঞ্জাব বটালার নিকট ঘোমান গ্রামে গিয়া বাস করেন। ১৪৪৬ খ্রীষ্টাব্দে সৈয়দবংশীয় শেষ রাজা আলম শাহ তাঁহার মঠ করাইয়া দেন ও মঠের জন্য ভূবৃত্তি দান করেন। এখন গুরুদাসপুর জেলায় যে নামদেবী-সম্প্রদায় দেখা যায় তাঁহারা নামদেবের শিষ্য বোহর দাসের বংশ। তাঁহারা বলেন, বিষ্ণুস্বামী নাকি নামদেবের শিষ্য ছিলেন।

বুলন্দসহরে বস্ত্রে ছাপ-দেওয়া ব্যবসায়ী এক হীন জাতীয় নামদেব জন্মিয়াছিলেন।

মার্‌বাড়ে ধুনিয়া বা তুলা-ধুনকরের বংশে আর এক নামদেব জন্ম-গ্রহণ করেন।

কবীরের নাম করিবার আগে রামানন্দের অন্যান্য শিষ্যদের নাম করা যাক্‌। রামানন্দের মুখ্য দ্বাদশ-জন শিষ্যের বাহিরে অনন্তানন্দের নাম।

অনন্তানন্দ

রাজপুতানা জয়পুরে আমেরের নিকট গলতায় তাঁর মঠ এখনো

প্রতিষ্ঠিত আছে। তাঁর শিষ্য কৃষ্ণদাসজীর জন্ম হিমালয় কুল্লু দেশে। আমেরের রাজা পৃথ্বীরাজ যোগিমতের ছিলেন, তিনি পরে কৃষ্ণদাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

কৃষ্ণদাসজী

এই কৃষ্ণদাসের শিষ্য অগ্রদাস ও কীল্‌হ। উভয়েই উত্তম কবি ছিলেন। কেবলরাম, হরিনারায়ণ, পদ্মনাভ, গদাধর, দেবদাস, কল্যাণদাস প্রভৃতি বহু ভক্ত এই শাখার। অগ্রদাসের বাণী—

অগ্রদাস ও কীল্‌হ

"সকল দেবন দেৱা সো ঈশ্বর ভগবান ভজো।"
সকল দেবতার দেবতা ঈশ্বর ভগবানকে ভজনা কর।
"জো দিন যায় আনন্দমেঁ জীবন কা ফল সোই।"
যে দিন আনন্দে গেল তাহাতেই জীবনের সাফল্য।
"অগ্র কহে হরি মিলনকো তনমন ডারো খোই।"
অগ্রদাস বলেন হরিকে পাইবার জন্য তনুমন তাঁহার মধ্যে হারাইয়া ফেল।

এই সব বাক্য সাধুদের মধ্যে খুব চলিত।

অগ্রদাসের শিষ্য নাভাজী। নাভা ডোমের ছেলে। দারিদ্র্যবশতঃ বিধবা মাতা তাঁহাকে ফেলিয়া দেন; অগ্রদাস অনাথ বালককে পালন করেন ও নূতন দৃষ্টি দান করেন। এই ডোমবংশে জন্মের কথা গোপন করিতে গিয়া অনেকে বলেন নাভার জন্ম হনুমানের বংশে।

নাভা

গুরু আজ্ঞা করেন 'নাভা, তুমি ভক্তদের জীবনী লেখ।' নাভা বলেন 'আমি মূর্খ, আমার কি সাধ্য?' শেষে গুরুর আজ্ঞায় ভক্তমাল রচনা করেন।

ভক্তমাল

প্রিয়াদাস

মাধ্বী সম্প্রদায়ের প্রিয়াদাস ভক্তমালের টীকা করিয়া উহাকে অনেকটা পূর্ণতর করেন।

লালদাস

প্রিয়াদাসের পৌত্র বৈষ্ণবদাস। তাঁহার সহায়তায় লালদাসজী "ভক্ত উরবসী" নামে আর একটি টীকা করিয়া ভক্তমালকে আরও পূর্ণ করেন। লালদাসজীর পূর্ব্ব নাম লক্ষ্মণদাস। ইঁহার বাসস্থান কান্ধেলে। রাধাবল্লভী সম্প্রদায়ের বল্লভ লালজীর শিষ্য হইয়া লালদাস নাম গ্রহণ করিলেন।

১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে রোহতকের লালা গুমানী লাল ভক্তমালকে আরো একটু বিশদ করেন।

১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে মীরাপুর বাসী রামপ্রসাদ ভক্তমাল সহজ ভাষায় লেখেন।

এই ভক্তমালে কৃষ্ণ ও রামপন্থী শাস্ত্রানুমোদিত আচার-শীল ভক্তদের কথাই বেশী। তাই নানক, দাদূ, রজ্জব প্রভৃতির নাম তাহাতে নাই। হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িকতাবুদ্ধি-হীন সাধকদের বিবরণ নাভার ভক্তমালে মিলে না।

তবে, নাভার ভক্তমাল ছাড়া রাঘবদাসজী প্রভৃতি আরও অনেক ভক্তের লেখা ভক্তমাল আছে। মঠে এবং সাধুদের স্থানেও বহু ভক্তের জীবনী রক্ষিত আছে।

কীল্হ

অগ্রদাসের গুরুভাই কীল্হ গুজরাতের সুবেদার সুমেরদেবের পুত্র। ইঁহার নাম শুনিয়া মথুরাতে রাজা মানসিংহ ইঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন ও ইঁহার সাধনায় চমৎকৃত হন।

খাকী সম্প্রদায় বলেন তাঁহাদের প্রবর্ত্তক কীল্‌হ। ফরক্কাবাদ, অযোধ্যা হনুমানগড় ও জয়পুরে তাঁহাদের স্থান আছে।

খাকী

রবিদাসের জন্ম কাশীর এক মুচী বা চামারের ঘরে। ভক্তমাল-হরিভক্তি-প্রকাশিকা মতে রবিদাস জুতা সেলাই করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতেন। রামানন্দের কৃপায় নবজীবন পাইলেও তিনি তাঁর ব্যবসা ত্যাগ করিলেন না। এক সাধু তাঁহাকে পরশ পাথর দিতে চাহিলেও তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই। তিনি বলিলেন, আমার এই স্বোপার্জ্জিত বৃত্তি ও সরল জীবনযাত্রাই ভাল।

রবিদাস

ভগবানের সাধনা ও সাধুগণের সেবার জন্য রবিদাস কোনো মতে একটি মঠ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণেরা রাজার কাছে নালিশ করিলেন—মুচী হইয়া এই ব্যক্তি সকল জাতির ধর্ম্ম নষ্ট করিতেছে। রাজা তাঁহাকে তিরস্কার করিতে ডাকাইয়া তাঁর উজ্জ্বল মুখভাব ও প্রেমছবি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন।

চিতোরের রাণী ঝালী তাঁর শিষ্যা হন। ব্রাহ্মণেরা রুষ্ট হইয়া রাজার কাছে নালিশ করিলেন। রাজার আজ্ঞায় ব্রাহ্মণেরা বেদপাঠ করিয়া ভগবানকে বিচলিত করিতে পারিলেন না; রবিদাস তাঁর সরল ভজনে ভগবানকে বিচলিত করিলেন।

কথিত আছে রাণী ঝালী গুরু রবিদাসকে এক যজ্ঞ উপলক্ষে আনাইলেন। ব্রাহ্মণেরা বলিলেন, আমরা এখানে পাক করা দ্রব্য খাইব না। তাঁহারা নিজেরা পাক করিয়া সকলে খাইতে বসিয়া নাকি দেখেন প্রতি দুইজনের মধ্যে রবিদাস খাইতে বসিয়াছেন।

ভক্তদের মতে মীরাবাঈ রবিদাসের শিষ্যা ছিলেন।

রবিদাসের ভজন প্রেমে ও ব্যাকুলতায় পূর্ণ। ত্রিশটির অধিক তাঁহার ভজন গ্রন্থ-সাহেবে গৃহীত হইয়াছে।

রবিদাসের নামে ভারতের সর্ব্বত্র মুচীরা নিজেদের রুইদাসী বলে; এই গৌরবে তাহারা গৌরবান্বিত।

রবিদাস বলেন—

রাম কহত সব জগ ভুলানা সো য়হ রাম ন হোই—

সকল লোক যে রামনামে ভুলিয়াছে আমার রাম সে রাম নহে।

সব ঘট অংতর রমসি নিরংতর মৈঁ দেখন নহিঁ জানা—

সকল ঘটে তুমি নিরন্তর বিরাজমান। আমিই তোমাকে দেখিতে শিখি নাই।

চলত চলত মেরো নিজমন থাক্যো অব মোসে চলা ন জাঈ॥

তাঁহার জন্য চলিয়া চলিয়া আমার নিজ মন ক্লান্ত হইয়াছে—আর তো ঘুরিয়া মরা যায় না।

জা কারণ মৈঁ দূর ফিরতো সো অব ঘটমেঁ পাঈ।

যাঁহার জন্য দূরে দূরে ঘুরিয়া মরিয়াছি তাঁহাকে এখন এই ঘটের মধ্যেই পাইলাম।

ভগবানের জন্য যে ব্যাকুলতা তাহা কি শাস্ত্র বা বেদপাঠে যায়?

কোটি বেদ বিধি উচরৈ রাকী বিথা ন জাঈ।

কোটি বেদ বিধি উচ্চারণ করিয়াও তাহার ব্যথা যায় না। তাহাকে দেখিতে পাইলে দেখি—

বিমল একরস উপজৈ ন বিনসৈ উদৈ অস্ত তহঁ নাঁহী।
বিগতাবিগত ঘটৈ নহিঁ কবহূঁ বসত বসৈ সব মাঁহী॥

সেই বিমল একরসের উৎপত্তিও নাই, বিনাশও নাই। তাহা বিগতাবিগত, তাহার ক্ষয় নাই, এই বস্তু সকলের অন্তরে বিরাজিত।

তখন দেখি চরাচরে সর্ব্বত্র তাঁর পূজা। "যেখানে যাই সেইখানেই দেখি তোমার পূজা চলিয়াছে।"

জহঁ জহঁ জাউ তুম্হরী পূজা॥

রবিদাস অতিশয় সেবাপরায়ণ ছিলেন। যখনই কোনো সাধুভক্তগণের মিলন হইত বা তীর্থস্থানে সকলে যাইতেন তখন সকলকে সেবা করিবার ভার ছিল রবিদাসের। তরুণ ও যুবক দলের সঙ্গেই তাঁর বেশী যোগ ছিল। তাঁদের লইয়া তিনি নানাবিধ সেবার কর্ম্ম করিতেন। এজন্য অনেকে অভিযোগ করিতেন যে "রবিদাসই তো এই সব ছেলেদের মতিগতি বিগড়াইয়া দিল।" এই সব সেবার প্রসঙ্গে রবিদাসের যে সব প্রার্থনা ও প্রণতি পাওয়া যায় তাহা অপূর্ব্ব।

সেনা

সেনা ভক্ত ছিলেন জাতিতে নাপিত; রামানন্দের কৃপায় তিনি নবজীবন প্রাপ্ত হন। ভক্তিজীবন লাভ করিয়াও সেনা রাজার ক্ষৌরকারের কাজ করিতেন। রাজা সেনার ভক্তিজীবনের পরিচয় পাইয়া তাঁর শিষ্য হন। সেনা ছিলেন বাঁধ্ নগরের অধিবাসী। এখনো সেখানকার রাজারা ভক্ত সেনার বংশীয়দের কাছে দীক্ষা লইয়া থাকেন।

ভবানন্দ ছিলেন পণ্ডিত। গুরু রামানন্দের আজ্ঞায় তিনি বেদান্ত শাস্ত্র সহজবোধ্য হিন্দীতে লেখেন, তাঁহার গ্রন্থের নাম অমৃতধার। ১৪টি অধ্যায়ে বেদান্তের সত্যগুলি হিন্দীতে সাধারণ লোককে বুঝাইবার জন্য লিখিত হইয়াছে।

ভবানন্দ

ধন্না ছিলেন জাতিতে জাঠ। ১৪১৫ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি তাঁর জন্ম। বাল্যকালে এক ব্রাহ্মণের কাছে তিনি কিছু উপদেশ পান; তখন হইতে তিনি যাহা কিছু ভোগ করিতেন তাহা ভগবানের সঙ্গে একত্র প্রেমে ভোগ করিতেন। ইহার অধিক সেই ব্রাহ্মণের কাছে জ্ঞান চাহিলে তিনি তাঁহাকে কাশীতে রামানন্দের নিকট যাইতে আদেশ করেন। রামানন্দ তাঁহার অনুরাগ দেখিয়া নীচ জাতি জাঠ বলিয়া আপত্তি করিলেন না। জাঠরা কৃষক। যখন সবাই কহিল—'ধন্না ভক্ত হইয়া তোর কি লাভ হইল? ইহা অপেক্ষা চাষ করিলে তুই একগুণ বীজে দশগুণ শস্য পাইতিস।' ধন্না বলিলেন, 'যে ক্ষেত্রে আমি এখন সেবা করিতেছি তাহাতে আমি সহস্রগুণ ফল পাইতেছি।' গ্রন্থসাহেবে ইঁহার রচিত ভজন আছে।

ধন্না

পীপার জন্ম ১৪২৫ খ্রীষ্টাব্দে; তিনি জাতিতে রাজপুত। রাজপুতানার অন্তর্গত গামরোহগড়ের তিনি রাজা ছিলেন। কাঠিয়াবাড়ের সাধুদের মতে রাজ্যের নাম গড়গাংগড় বা গগরৌংগড়। ইনি প্রথমে শাক্ত ছিলেন, পরে রামানন্দের কাছে ভক্তিপথের উপদেশ পাইয়া রাজ্য ত্যাগ করিয়া যান। পীপা যখন রাজ্য ত্যাগ করিয়া যান

পীপা

তখন রাণীরা সঙ্গে যাইতে চাহেন। পীপা রাজী হন না। রামানন্দ বলিলেন, যদি ইঁহারা রাজ ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া সহজ ভাবে তোমার সঙ্গে যান তবে বাধা দিবার কি আছে? এই সর্ত্তে ছোট রাণী সীতা সঙ্গে গেলেন।

কথিত আছে, পীপা সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া ভগবানের সাক্ষাৎ পান। পীপার অঙ্গে ভগবানের ছাপ লাগিয়া থাকে। সেই অবধি দ্বারকায় পীপার মঠে ভক্তদের অঙ্গে ভগবানের মুদ্রার ছাপ দেওয়া হয়।

দ্বারকার পথে চিঘড় ভক্ত এত দরিদ্র ছিলেন যে পরিধেয় বস্ত্র বেচিয়া পীপার সেবা করেন। পীপা সারঙ্গ বাজাইয়া ও রাণী সীতা গান ও নৃত্য করিয়া অর্থসংগ্রহ করিয়া তাঁহাদের কিছু সাহায্য করিয়া যান।

দ্বারকার পথে পীপাবটে তাঁর এক বড় মঠ আছে। এই মঠ অতিথি-সেবার জন্য খ্যাত। শিখ্ সাধুদের ধর্ম্ম উৎসবে পীপার গান শুনিতে পাওয়া যায়। গ্রন্থ-সাহেবে তাঁহার ভজন আছে।

সুখানন্দ

সুখানন্দ স্বভাবতই ভক্ত ও প্রেমিক ছিলেন তাই রামানন্দের সঙ্গে পুরাতন সম্প্রদায় হইতে চলিয়া আসিলেন। সুখানন্দের পূর্ব্বপুরুষেরা নাকি তন্ত্রশাস্ত্রের মতাবলম্বী ছিলেন। এইজন্য সুখানন্দ কৃত গ্রন্থকে অনেকে ভক্তিতন্ত্র বলেন। ইঁনি দিনরাত ভগবানের প্রার্থনায় মজিয়া থাকিতেন। গুরুর আদেশে সুখানন্দ সকল প্রকার কর্ম্মই করিতেন—কিন্তু কর্ম্মের সঙ্গে তাঁহার অন্তরে ভগবানের নাম চলিত এবং তাঁহার দুই চক্ষু জলে ভাসিয়া যাইত। সাধকদের মধ্যে তাঁহার বাণীর খুব আদর আছে। কর্ম্ম ছিল তাঁর জপমালা।

সুরসুরানন্দ রামানন্দের সংস্পর্শে আসিয়া নবজীবন পাইলেন।

সুরসুরানন্দ

ভক্ত হইয়া তিনি সাধনার নিমিত্ত যখন সংসার ত্যাগ করিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন তখন তাঁহার স্ত্রী তাঁহার সঙ্গে যাইতে চাহিলেন। তিনি অস্বীকৃত হওয়ায় তাঁহার স্ত্রী গুরু রামানন্দের কাছে গিয়া নিজ আবেদন জানাইলেন। রামানন্দ সুরসুরানন্দকে কাহলেন—'তোমার স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবার হেতু কি? তিনি ভক্তিমতী, তোমার আদর্শে শ্রদ্ধান্বিতা—তাঁহাকে লইয়াই কেন সাধনার্থ যাও না?' সুরসুরানন্দ কহিলেন—'তিনি সুন্দরী ও তরুণী, সুতরাং পথে নানা বিঘ্ন বাহির হইতে আসিতে পারে।' রামানন্দ কহিলেন—'তুমি পুরুষ, স্বীয় পৌরুষে তাঁহাকে সকল বিঘ্ন হইতে রক্ষা করিবে। নহিলে অন্যের উপর এই দায় ফেলিয়া যাওয়ায় কি কোনো পৌরুষ আছে?' তাই সুরসুরানন্দ নিজ পত্নী-সহ সাধনায় গেলেন। বিধর্ম্মী দুষ্টলোকেরা বিঘ্ন করিবার চেষ্টা করিলেও তাহাতে কৃতকার্য্য হয় নাই—ভগবান্ স্বয়ং প্রচণ্ডরূপ হইয়া তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম হরিভক্তি-প্রকাশিকা মতে সুরসরিজী।

কবীর

[মধ্যযুগে যাঁহার সাধনা সর্ব্বাপেক্ষা সকলের চিত্তে আপন প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তিনি রামানন্দ-শিষ্য কবীর। কবীরের পর উত্তর-ভারতে সংস্কারমুক্ত যে কোনো ধর্ম্মমত মধ্যযুগে হইয়াছে তাহার প্রত্যেকটার উপর প্রত্যক্ষতঃ অপ্রত্যক্ষতঃ কবীরের প্রভাব অসামান্য।]

'কবীর-কসৌটী'কারের মতে দেখা যায় [১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দে

কবীরের মৃত্যু। তিনি নাকি ১২০ বৎসর আয়ু পাইয়াছিলেন, তদনুসারে তাঁর জন্ম হয় কাশীতে ১৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দে। য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা কসৌটীতে দেওয়া মৃত্যু তারিখ মানিতে রাজী কিন্তু জন্ম তারিখ নয়। কেবল হাণ্টার (Hunter) বলিয়াছেন ১৩০০-১৪২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কবীরের সময়। বিল (Beal) বলেন যে ১৪৯০ পর্যান্ত কবীর জীবিত ছিলেন। খ্রীষ্টীয় মিশনারীরা কবীরের মৃত্যুকাল প্রামাণ্য ধরিয়া ১৪৪০-১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাঁহার সময় ধরিয়াছেন। কিন্তু নাগরী প্রচারিণী সভার শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর দাস একখানি পুরাতন কবীর বাণীর পুঁথি পাইয়াছেন—তাহা ১৫০৪ খ্রীষ্টাব্দের লেখা। এবং ভারত ব্রাহ্মণের মতে কবীরের জন্ম কাল পাওয়া গিয়াছে ১৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দ, ও মৃত্যু কাল ১৪৪৮ খ্রীষ্টাব্দ। সর্ব্বোপরি ডাক্তার ফ্যুরের (Führer) লিখিত 'উত্তরপশ্চিম-প্রদেশ ও অযোধ্যার স্থাপত্যকীর্ত্তি ও শিলালেখমালা' (Monumental Antiquities and Inscriptions in the North-Western Provinces and Oudh) গ্রন্থে আছে যে, বস্তী জেলার অন্তর্গত খিরনী নগরের পূর্ব্বভাগে অমী নদীর তীরে বিজলী খাঁ স্থাপিত কবীরের একটি রৌজা পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে স্থাপনের তারিখ আছে ১৪৫০ খ্রীষ্টাব্দ। আবার ১৫৬৭ খ্রীষ্টাব্দে নবাব ফিদই খাঁ রৌজাটি সংস্কার করিয়া দেন। কাজেই ভারত ব্রাহ্মণের লিখিত ১৪৪৮ খ্রীষ্টাব্দে কবীরের মৃত্যুই প্রামাণ্য। মৃত্যুর দুই বৎসর পরেই রৌজা স্থাপিত হয় এবং বিজলী খাঁ-ই ইহার দুই বৎসর পূর্ব্বে কবীরের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে মগহরে কবীরের সমাধি-মন্দির প্রস্তুত করেন। মুসলমান

সাধকদের চিত্তের উপর কবীরের কতখানি প্রভাব ছিল তাহা এই ঘটনা হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

সন্দেহ নাই যে কবীর মুসলমান জোলার পুত্র। এই কথাটি গোপন করিবার জন্য ভক্তমাল ও তাহার টীকা হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্ত্তী সব হিন্দুলেখকই প্রভূত চেষ্টা করিয়াছেন। কবীর যে জোলা সে তাঁর নিজ বচনেই প্রমাণিত, তারপর তাঁর নাম। তবু হিন্দুলেখকেরা বলেন, তিনি মুসলমানের ঘরে পালিত হইলেও ছেলে ব্রাহ্মণেরই। কেহ কেহ বলেন তিনি তো সত্য নিরঞ্জন পুরুষ তাঁহার আবার জন্ম কি? তিনি লীলা করিতে কাশীর নিকট লহরতালাও সরোবরে কমলে শুইয়াছিলেন। জোলা নীরু ও তাঁর পত্নী নীমা তাঁহাকে পাইয়া পিতামাতা রূপে পালন করেন মাত্র।

যাক্ সে কথা, দাদূপন্থের নানা গ্রন্থে এবং আরও বহু বহু সাক্ষ্য অনুসারে ইহা স্পষ্ট বুঝা গিয়াছে কবীর ছিলেন মুসলমান জোলারই ছেলে। ঐতিহাসিক আবুল ফজল ও দবিস্তান বলেন, "কবীর জোলার বংশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।" তাঁহারা বলেন "তবু তাঁহাকে ঠিক মুসলমান বলা যায় না, কারণ তিনি মুয়হিদ বা ঈশ্বরবিশ্বাসী ভক্ত ছিলেন।" হিন্দু জোলারই অনেকে মুসলমান হইয়া গিয়াছিল। এই শ্রেণী হিন্দু সমাজে যেরূপ নিরক্ষর ও অশিক্ষিত ছিল মুসলমান হইয়াও প্রায় সেইরূপই কুসংস্করাচ্ছন্ন অশিক্ষিত। এমন বংশে ভগবান্ এত বড় মহাপুরুষের জন্ম দিয়া তাঁহার আপন সত্যের জয়ই ঘোষণা করিলেন।

তিনি রামানন্দের কাছে নবচেতনা লাভ করিলেন, তাঁর কাছে ধর্ম্ম সাধনা গ্রহণ করিলেন; জাতিভেদ, পৌত্তলিকতা,

তীর্থ, ব্রত, মালা, তিলক প্রভৃতি কিছুরই ধার ধারিলেন না। সকল কুসংস্কারের মূলে তিনি প্রচণ্ড বলে আঘাত করিলেন। সময় থাকিলে সেই সব বিষয় তাঁর নিজের বাণী হইতেই সুন্দর-রূপে দেখাইয়া দেওয়া যাইত।

অন্ধকারে রামানন্দ তাঁর গায়ে পা দিয়া রাম রাম করিয়া উঠিলে কবীর সেই মন্ত্র গ্রহণ করিলেন, এ সব বাজে কথা। কারণ, রামানন্দ আচার মানিয়া চলেন নাই বলিয়াই তাঁর নূতন পন্থের আরম্ভ। তাঁর বহু শিষ্যই সমাজ-বিধি অনুসারে বর্জ্জনীয়।

রামানন্দের কাছে সাধনা লইয়াও কবীর হিন্দু-মুসলমান সকল দলের ভক্ত ও জ্ঞানীদের সঙ্গেই আলাপ করিয়া বেড়াইতেন। সূফীদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল। সেখ তক্কীর সঙ্গে কবীরের বেশ একটু ঘনিষ্ঠতা হয়—তক্কী ছিলেন সূফীদের সুররদী শাখার অন্তর্ভুক্ত।

সাধনার জীবন লইয়াও কবীর বিবাহ করিলেন। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল লোই। তাঁর পুত্র হইলেন কমাল, ইহা ভিন্ন কমালী নামে তাঁর এক কন্যাও ছিলেন। এসব কথাও এখন ভক্তেরা চাপিয়া যাইতে চান।

এই কমাল একজন ভক্ত ও গভীর চিন্তাশীল সাধক ছিলেন।

কমাল

কবীরের মৃত্যুর পর যখন কমালকে সকলে বলিল তুমি তোমার পিতার শিষ্যদের লইয়া সম্প্রদায় গড়িয়া তোল, তখন কমাল বলিলেন, আমার পিতা চিরজীবন ছিলেন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে—আর আমিই যদি সম্প্রদায় স্থাপন করি তবে পিতার সত্যকে হত্যা করা হইবে,

ইহা একপ্রকার পিতৃহত্যা। সে কাজ আমার দ্বারা সম্ভব হইবে না। তখন অনেকে বলিলেন—

'ডূবা বংশ কবীরকা জো উপজা পূত্র কমাল।'

অর্থাৎ, পুত্র কমাল জন্মিয়াই কবীরের বংশ ডুবিল। এই কথাটির অবশ্য আরো নানা ভাবে প্রয়োগ আছে।

কবীরের কন্যা কমালীর সঙ্গে একজন ব্রাহ্মণের বিবাহ হয়।

সুরত গোপাল

পরবর্ত্তীকালে কবীরের মতবাদ প্রধানতঃ দুই ভাগে ভাগ হইয়া গেল। কবীরের বাণীর যে সংগ্রহ 'বীজক' নামে খ্যাত তাহা গ্রহণ করিয়া সুরত গোপাল কাশীতে কেন্দ্র স্থাপন করেন। তাঁহারা ক্রমে ক্রমে শাস্ত্রের দিকে ও বিশেষতঃ বেদান্তাদির দিকে ঝুকিতে লাগিলেন। এই বীজকের বিখ্যাত টীকাকার বঘেলখণ্ডের রাজা বিশ্বনাথ সিংহজী। তাঁহার কৃত টীকার নাম বঘেলখণ্ডী টীকা।

ধর্ম্মদাস

কবীরের বাণিয়া শিষ্য ধর্ম্মদাস গিয়া ছত্রিশগড়ে কবীর-সম্প্রদায় স্থাপন করিলেন। তাঁহারা কবীর সাগর প্রভৃতি অন্যান্য সংগ্রহও আদর করেন এবং বীজকের ত্রিজ্যা টীকার সমাদর করেন।

ধর্ম্মদাস বিবাহিত ছিলেন, তিনি সস্ত্রীকই সাধনার জগতে আসিলেন। তাঁর শাখার গুরুদের আজিও বিবাহিত হইতে হয় এবং তাঁদের সন্তানরাই পরে গুরু হন। কুদরমাল হইতে সরিয়া আসিয়া এখন ইঁহাদের প্রধান মঠ দামাখেড়ায়। অল্প দিন হইল এই মঠের শেষ মহান্ত দয়ানাম সাহেব অপুত্রক মারা গিয়াছেন। ধর্ম্মদাসের কথা পরে বলা যাইবে।

এই ছত্রিশগড়ী শাখারই খুব প্রভাব। ইঁহাদের সংখ্যা ইঁহারা বলেন ৪২ লক্ষ। সুরতগোপলী বা কাশীর মঠের অনুগত ভক্ত-সংখ্যা খুবই কম। কবীরের মৃত্যুস্থান মগহরে, তাঁর ভক্ত বিজলী খাঁ স্থাপিত একটি মুসলমান সমাধিও আছে।

ভক্তদের বিবাদ

কবীর যখন মারা যান তখন তাঁর মৃতদেহ লইয়া হিন্দু-রাজা বীরসিংহ ও মুসলমান বিজলী খাঁ পাঠানের মধ্যে ঝগড়া হয়। বীরসিংহ চান হিন্দুমতে দেহ দাহ করিতে, বিজলী খাঁ চান গোর দিতে। কিন্তু মৃতদেহের আবরণ মোচন করিয়া নাকি দেখা গেল কতকগুলি ফুল মাত্র পড়িয়া আছে। তার অর্দ্ধেক মুসলমান ভক্তেরা মগহরে কবর দেন আর বাকী অর্দ্ধেক হিন্দুরা কাশীতে আনিয়া দাহ করেন। মগহরে এখনো কবীরের পন্থায় দীক্ষিত মুসলমান সাধক কেউ কেউ আছেন।

এই দেহ লইয়া বিবাদ কেন হইল বুঝা যায় না। কারণ হিন্দু শাস্ত্রানুসারেও তো সাধকদের দেহ দাহ করার নিয়ম নাই।

কবীরের বাণীর সব একত্র করিলে একটি বিরাট্ সংগ্রহ হয়। তাহাতে একই কথার অনেক সময় পুনরুক্তি দেখা যায়—কেননা, তাঁর মুখের একই বাণী নানা জনে নানা ভাবে লইয়াছে বা একই সত্য পাত্রানুসারে তিনি এক আধটু পরিবর্ত্তিত করিয়া বলিয়াছেন। আবার কবীরের অতি গভীর এমন সব বাণী ও কথা সাধুদের মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছে যাহা বীজক বা সাগর প্রভৃতি সংগ্রহে প্রকাশিত হয় নাই।

কবীর সহজ জীবনযাত্রারই পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি জোলার কাজই করিতেন; কাপড় বুনিয়া বাজারে বিক্রয় করিতেন। সাধনা

অর্থে তিনি শ্রমবিমুখতা বুঝিতেন না। তিনি বলিয়াছেন এমন শ্রম করিবে যাহাতে ভিক্ষার উপর নির্ভর না করিয়া নিজের চলে এবং সম্ভব হইলে অপরকেও সহায়তা করা যায়।

কহৈঁ কবীর অস উদ্যম কীজৈ।
আপ জীয়ৈ ঔরন কো দীজৈ॥

তাঁর মতে সকলেই উপার্জ্জন করিবে, পরস্পরকে সাহায্য করিবে, কেহই অসঙ্গতরূপে সঞ্চয় করিবে না। অর্থ উপার্জ্জন করিয়া লোকসেবায় অর্থস্রোত চলন্ত রাখিলে কোনো বিকার ঘটিতে পারে না। এই স্রোত বন্ধ হইলেই নানা বিকার ঘটে, নানা দুঃখ ও অন্যায়ের সৃষ্টি হয়। এই সব মতামত লইয়া দাদূ পরে তাঁহার 'ব্রহ্মসম্প্রদায়' স্থাপন করিয়াছিলেন।

হিন্দু বা মুসলমান কোনো সমাজেরই অর্থহীন বাহ্য আচারকে তিনি গ্রহণ করেন নাই। মিথ্যা আচারকে আঘাত করিবার অসাধারণ শক্তি তাঁর ছিল। কথিত আছে, তাঁর গুরু রামানন্দের মৃত্যু হইলে শ্রাদ্ধার্থ সব শিষ্যরা তাঁহার কাছে দুগ্ধ চাহিতে আসিলেন। তিনি মরা গরুর অস্থি-পঞ্জরের কাছে আসিয়া দুগ্ধ চাহিলেন। লোকেরা তিরস্কার করিলে তিনি কহিলেন, মরা মানুষের খাদ্য হিসাবে মরা গরুর দুধই ভালো।

কাশীতে তিনি চিরদিন ছিলেন। কাশীতে মৃত্যু হইলে মুক্তি হয় ইহা সকল হিন্দুর ধারণা। তাই তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে বলিলেন, আমাকে কাশী হইতে দূরে লইয়া যাও। তাই সকলে তাঁহাকে বস্তী জেলায় মগহরে লইয়া গেল। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

নির্ভয়জ্ঞান গ্রন্থে এক সংস্কারমুক্ত অভিমানী মুসলমান বংশজাত জ্ঞানীর কথা আছে। তিনি সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতেন বলিয়া

তাঁর নাম হয় জাহানগস্ত। কবীরের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়া প্রাঙ্গণে একটি শূকর দেখিয়া তিনি ঘৃণায় চলিয়া যাইতেছিলেন। কবীর বলিলেন, 'বাবা এখনো তোমার এই সব সংস্কার আছে। শূকর তো মলিনতা, অন্তরে কি তাহা নাই?' জাহানগস্ত লজ্জিত হইলেন।

ইতিহাস-সম্মত হউক বা না হউক ভক্তদের ইতিহাসে আছে, হিন্দু-মুসলমান উভয়ের অভিযোগে শিকন্দর সাহ লোদী তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠান। অভিযোগকারীর কাত্রায় উভয় দলকে একত্র দেখিয়া কবীর উচ্চ হাস্য করিয়া কহিলেন—'ঠিকই হইয়াছে, তবে ঠিকানায় একটু ভুল হইয়াছে।' বাদশাহ বিরক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ব্যাপার কি?' কবীর কহিলেন, 'হিন্দু-মুসলমানকে মিলানোই আমার লক্ষ্য ছিল। সবাই বলিত তাহা অসম্ভব; আজ তাহা সম্ভব দেখিলাম। তোমার মত জগতের রাজার সিংহাসনের তলেই যদি তাহা সম্ভব হইয়া থাকে তবে বিশ্বের অধিপতির সিংহাসন-তলে কি আরও প্রশস্ত স্থান মিলিবে না?' বাদশাহ লজ্জিত হইয়া কবীরকে ছাড়িয়া দিতে বলিলেন। অথচ 'ফিরিস্তা' মতে কাজী পীলা সেখ বূদের সঙ্গে মতভেদ হওয়ায় শিকন্দর সাহ ব্রাহ্মণ বূদনের প্রাণদণ্ড করেন। ব্রাহ্মণের অপরাধ—সে বলিয়াছিল ভগবানের কাছে সকল ধর্ম্মই সমান।

গোরক্ষনাথ, নাথপন্থ, নিরঞ্জনপন্থ, বৈষ্ণবভাব ও ব্রহ্মবাদের বিস্তর প্রভাব কবীরের বাণীতে পাওয়া যায়। গোরক্ষনাথের সঙ্গে যে তাঁর আলাপ পাই তাহা বোধ হয় সেই পন্থী কোনো সাধুর সঙ্গে আলাপ লইয়া লেখা। সেকালের সকল মতের সাধকদের সঙ্গে আলাপই তাঁর সম্প্রদায়ে রক্ষিত আছে।

সরল হৃদয়ের কথা সহজ ভাষায় তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন—তাই তাঁর সরল বাণীর অপার শক্তি। চলিত হিন্দী ভাষাতেই তিনি উপদেশ করেন। তিনি ত আর পণ্ডিত নন—সংস্কৃতের ধার তিনি ধারিতেন না।

তাই কবীর বলিয়াছেন—

সংস্কৃত কূপ জল কবীরা ভাষা বহতা নীর

হে কবীর, সংস্কৃত হইল কূপ জল; ভাষা হইল প্রবহমান জলধারা।

তিনি নানাভাবের সাধকদের সঙ্গে মিলনের পিপাসায় ভারতের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়াছেন। পুরী প্রভৃতি স্থানে তো দীর্ঘকালই তিনি ছিলেন।

'কবীর-মন্‌শূর' প্রভৃতি গ্রন্থমতে কবীর মক্কা, বগ্‌দাদ, সমরখন্দ, বোখারা প্রভৃতি স্থানে সাধকদের সঙ্গে দেখা করিয়াছেন। বগ্‌দাদ তখন সাধকদের উদার চিন্তার একটি প্রসিদ্ধ ক্ষেত্র ছিল।

বাবা নানক বগ্‌দাদে যে স্থানে গিয়াছিলেন সে'টি নাকি এখন একটি পবিত্রস্থান। তাহাতে তুর্কী ভাষায় শিলালেখ আছে। ৯১৭ হিজরায় বাবা সেখানে যান—এখনো সৈয়দ বংশীয় বাবার ভক্তের বংশধর সেই স্থান রক্ষা করেন। ১৯১৯ এর ৯ই এপ্রিলের বগ্‌দাদের আরবী কাগজ 'দর্‌উল-সালাম'এ এই বিষয়টি ও শিলালিপির প্রতিলিপি বাহির হইয়াছে।

গুজরাতে নর্ম্মদা তীরে কবীর যখন যান তখন তত্ত্ব ও জীব নামে দুই ভাইয়ের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। সেখানে কবীরের নামে প্রসিদ্ধ এক বিরাট্ বটবৃক্ষ আছে—নর্ম্মদা-তীরে ভরুচ হইতে তাহা বারো তেরো মাইল দূরে শুক্লতীর্থের কাছে একটি

দ্বীপ জুড়িয়া বিরাজমান। এখানে নাকি তাঁর স্পর্শে মৃত তরু প্রাণ পাইয়াছিল।

পুরাতন হইলেই একটি কথাকে কবীর সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে রাজী ছিলেন না। তিনি সত্যকে পরখ করিয়া লইতেন। এজন্য তাঁর পরখ-বাণী আছে। নীতি উপদেশের বাণী আছে। তদনুসারে সাধনা করিয়া তত্ত্ব জানিতে হয়—তাই সাধনা ও তত্ত্বের বাণী আছে। সর্ব্বশেষের অবস্থা হইল প্রেমের। সেই প্রেমের বাণীও কবীরের আছে।

সময় ও সুযোগ থাকিলে কবীরের বাণী তুলিয়া দিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিতাম তাঁর বাণী কত গভীর ও মধুর।

[তাঁহার উপদেশের মোট কথা এই—সত্যের জন্য, ধর্ম্মের জন্য সব কৃত্রিম বাধা পরিত্যাগ করিয়া সত্য হও, সহজ হও। সত্যই সহজ। সেই সত্যকে বাহিরে খুঁজিয়া বেড়াইবার দরকার নাই। তীর্থে, ব্রতে, আচারে, তিলকে, মালায়, ভেখে, সাম্প্রদায়িকতায় সত্য নাই। সত্য আছে অন্তরে, তার পরিচয় মেলে প্রেমে, ভক্তিতে, দয়ায়। কাহারও প্রতি বৈরভাব রাখিবে না, হিংসা করিবে না—কারণ, প্রতি জীবে ভগবান্ বিরাজিত। বিভিন্ন ধর্ম্মের নাম-ভেদের মধ্যেও সেই এক ভগবানের জন্য একই ব্যাকুলতা—কাজেই ঝগড়া বৃথা। হিন্দু মুসলমান বৃথাই এই ঝগড়া করিয়া মরিল। অহঙ্কার দূর করিয়া, অভিমান ত্যাগ করিয়া, কৃত্রিমতা ও মিথ্যা পরিহার করিয়া সকলকে আত্মবৎ মনে করিয়া ভগবৎ প্রেমে ভক্তিতে চিত্ত পরিপূর্ণ কর—তবেই সব সাধনা সফল হইবে। জীবন ক্ষণস্থায়ী, বৃথা কাল নষ্ট না করিয়া ভগবানের শরণাপন্ন হও। বাহিরে যাইবার দরকার নাই,

তোমার অন্তরেই তিনি আছেন; সেখানেই সহজে তাঁহাকে পাইবে। শাস্ত্র, তীর্থ, আচার ও তর্কের পথে বৃথা ঘুরিয়া মরিবে।

কবীর বৃথা কায়াকষ্টের পক্ষপাতী ছিলেন না। পবিত্র ভাবে সহজ জীবন যাপন করিয়াই সাধনা চলে, এই তাঁর মত। তিনি বলেন নিজের মধ্যেই ব্রহ্মাণ্ড, কাজেই বাহিরে না ঘুরিয়া অন্তরে বিশ্বতত্ত্বকে প্রত্যক্ষ কর, বিশ্বনাথ সেখানে বিরাজমান। বাহিরে ভিতরে কোনো প্রভেদ নাই—সকল ভেদ ভগবানের মধ্যে যোগ লাভ করিয়াছে। সকলের সঙ্গে যোগেই পরিপূর্ণ সত্য ও সার্থকতা লাভ হয়।

গান

কবীরের অনেক বাণীই গান। মধ্যযুগের প্রায় সকল ভক্তই গান-প্রিয়; কবিতা ও গানেই ইঁহারা আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। কবীর নিজে যেমন উত্তম রচয়িতা ছিলেন তেমনি উত্তম গায়কও ছিলেন।

কবীর-পন্থীদের মধ্যে শ্বাসে শ্বাসে নাম জপ প্রচলিত আছে। জাতিভেদ, পৌত্তলিকতা, সম্প্রদায়গত ভেদবুদ্ধির বিরুদ্ধে কবীর অগ্নিময়ী বাণী উচ্চারণ করিয়া গিয়াছেন।

এখন কবীর-পন্থী ধর্ম্মদাসী সম্প্রদায়ে যে চৌকা পদ্ধতি আছে তাহা দেখিয়া তান্ত্রিকদের চক্র মনে হয়। চৌকায় যদিও নীতি-বহির্ভূত কিছুই নাই তবু ইহা বাহ্য অনুষ্ঠান তো বটে। ব্যক্তি-গত সাধনাকে সামাজিক অনুষ্ঠানে পরিণত করিতে গিয়া তান্ত্রিকরা যে কারণে চক্রের প্রয়োজন বুঝিয়াছেন কবীর-পন্থীরাও সেই কারণে চৌকার প্রয়োজন মনে করিয়াছেন। এক ভাবের

ভাবুক সাধকরা যদি সামাজিক ভাবে মাঝে মাঝে একত্র না হন তবে সাধনা দুর্ব্বল হইয়া আসে।

বাবা নানক সম্বন্ধে মেকলিফ ট্রাম্প প্রভৃতি পণ্ডিতেরা এত আলোচনা করিয়াছেন এবং নানকের শিষ্যদের মধ্যে এত পণ্ডিত ও কৃতবিদ্য লোক আছেন যে নানক ও শিখধর্ম্ম সম্বন্ধে নূতন কথা বলিবার আমার আর বিশেষ কিছু নাই। তাই শুধু দু'একটি কথা বলিতে চাই।

নানক

১৪৬৯ খ্রীষ্টাব্দে নানক লাহোরের নিকট তলবণ্ডীতে জন্ম-গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা শস্যবিক্রেতা ছিলেন। ভক্তগণের মতে নানকের যখন যুবা বয়স তখন বৃদ্ধ কবীরের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। কবীর তাঁহাকে দেখিয়া তুষ্ট হইয়া বলেন—ভবিষ্যতের জন্য আর আমার ভয় নাই। সমর্থ মানুষকে দেখিয়া আমি চলিয়া যাইতেছি।

কবীরের ভাবের দ্বারা নানক অনেক পরিমাণে প্রভাবান্বিত হন। নানকের বাণীর মূল সত্যগুলি অনেকটা কবীরের সত্যের সঙ্গে মেলে। 'গ্রন্থসাহেবে' কবীরের অনেক বাণী গৃহীত হইয়াছে।

গায়ক মর্দ্দানাকে লইয়া নানক বহু স্থান ভ্রমণ করিয়াছেন। নানক যে বগদাদ গিয়াছিলেন তাহা কবীরের প্রসঙ্গেই বলা হইয়াছে। সে ভ্রমণে মর্দ্দানা তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। নানকের বাণীগুলি পাঞ্জাবী মিশ্রিত হিন্দীতে রচিত। নানক অতিশয় সঙ্গীতপ্রিয় ও নিজে সঙ্গীত রচয়িতা ছিলেন।

নানক পৌত্তলিকতা, জাতিভেদ ও সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির বিরুদ্ধে যথেষ্ট বলিয়াছেন। প্রেমের পথে আত্মবিসর্জ্জনই

হইল তাঁর মতে প্রথম সাধনা। সব কৃত্রিম ছাড়িয়া এক পরমেশ্বরকেই ভজনা করিতে হইবে। অন্তরের মধ্যেই অন্বেষণ করিলে সকল রত্ন মেলে।

নারীর প্রতি তাঁর মত বুঝা যায় এই বাণী দেখিলে—'যাঁহার গর্ভে মানবের চালকেরা (রাজা) জন্মগ্রহণ করেন তাঁহাকে কেন মন্দ বল?'

'মিথ্যা আপনাকে আপনি ক্ষয় করে, সত্যই শেষ পর্য্যন্ত জয়ী।'

নানকের জপজীর বাণীগুলি কবীরের বাণী হইতে তবু একটু বেশী হিন্দুভাবাপন্ন—যদিও মুসলমান ভক্তেরা বলেন নানক সৈয়দ হুসেন নামক এক মুসলমান সাধকের কাছে মুসলমান সাধনা শিক্ষা করেন। বগ্‌দাদে নানকস্থানে নাকি তাঁর বাণী-সংগ্রহ আরবী ভাষায় আছে। তাহা যদি সত্য হয় তবে তাঁকে সূফীও বলা চলে। (রামদাস বিসনদাস লখানী—Temple of Guru Nanak in Baghdad.)

নানকের পর আরও ৯ জন বিখ্যাত গুরু শিখধর্ম্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

ষষ্ঠগুরু অর্জ্জুন ১৬০৪ খ্রীষ্টাব্দে আদিগ্রন্থ সংগ্রহ করেন।

শিখগ্রন্থ

আদি গ্রন্থের সঙ্গে পরবর্ত্তী গুরুদের বাণী যোগ করিয়া গ্রন্থসাহেব রচিত হয়। ইহাতে রামানন্দ, নামদেব, কবীর, রবিদাস, পীপা, সেখ ফরীদ প্রভৃতি ভক্তদের বাণী আছে তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তা ছাড়া নানক, অঙ্গদ, অমরদাস, রামদাস, অর্জ্জুন, তেগ বাহাদুর প্রভৃতি গুরুর পদ আছে—গুরু গোবিন্দের একটি দোঁহাও আছে। এই গ্রন্থের আরম্ভে নানক-রচিত জপজী—

তারপর সব পদ রাগ অনুসারে ভাগ করা। ইহাই মধ্যযুগের দাদূ, রজ্জব প্রভৃতি সকল ভক্তের গান বা সবদ বিভাগের পদ্ধতি। এই রাগাবলীর পরে আছে ভোগ বা স্তব এবং দোঁহা বা শ্লোক-সংগ্রহ। গোবিন্দ ছাড়া আর সকলেই নানকের নামে পদরচনা করিয়াছেন। ভোগ অঙ্গে ত্রিলোচন-কৃত পদ ও জয়দেব-কৃত পদ আছে। জয়দেবের বাণীতে ভাষাটি সংস্কৃত মিশ্রিত ভাষা।

মুসলমান রাজাদের অত্যাচার ও আক্রমণের প্রতিকার করিতে দশম গুরু গুরুগোবিন্দ শিখ খাল্‌সা সৈন্য রচনা করেন। দাদূর খাল্‌সা কিন্তু এই খাল্‌সা নহে। ব্রজভাষায় ও পাঞ্জাবীতে গুরু গোবিন্দের অনেক বাণী আছে।

গুরু গোবিন্দের মৃত্যুর পর ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ভাই মণি সিংহ গুরু গোবিন্দের বাণীগুলি একত্র করেন। পুরাতন গ্রন্থসাহেব হইতে এই সংগ্রহ যে বিভিন্ন তাহা বুঝাইবার জন্য ইহার নাম দেন 'দশম গুরুর গ্রন্থসাহেব।' এই গ্রন্থের বাণীগুলিতে আধ্যাত্মিক ভাব অপেক্ষা বীর ও পৌরুষ ভাবই বেশী।

জায়সী

মালিক মুহম্মদ জায়সীর কথা পূর্ব্ব বক্তৃতায় বলা হইয়াছে। তবু এখানে বলি, তিনি কবীরের ভাবের দ্বারা বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত। তাঁহার 'পদ্মাবতী' অতি উদার ধর্ম্ম ভাবের সহিত লেখা। ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থখানি লেখা হয়। তাঁহার চারি বন্ধুর মধ্যে দুইজন ভোজপুররাজ জগৎদেবের সভাসদ ছিলেন। তাঁর মধ্যে মিঁয়া সলোনে ছিলেন আসলে সলোনে সিংহ। মিঁয়া শুনিয়া মনে হয় মুসলমান। জায়সী চিশ্‌তিয়া সম্প্রদায়ের সাধক মহীউদ্দিনের

শিষ্য। সংস্কৃতেও ইনি পণ্ডিত ছিলেন, পদ্মাবতী ভক্তদের কাছে পারমার্থিক উপদেশের জন্য সমাদৃত। তাঁর সমাধিস্থানে এখনো বহু ভক্ত একত্র হন।

কবীর-পন্থ

কবীর পন্থের দুই ধারা। কাশীর ধারা সুরতগোপালের স্থাপিত। কবীর চৌড়ায় ইঁহাদের মুখ্য-স্থান। পুরী দ্বারবতী ও মগহরেও ইঁহাদের স্থান আছে। ইঁহাদের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

ধর্ম্মদাসী শাখা

ধর্ম্মদাসী শাখার প্রধান স্থান ছত্রিশগড়ে। ইঁহাদের সম্প্রদায়ে এখন ৪২ লক্ষ লোক। কাশীর শাখার লোকসংখ্যা বেশী নয়। ছত্রিশ-গড়ী শাখার কবীর-পন্থী নেপালে, সিকিমে, হিমালয়-প্রদেশে, পঞ্জাবে, সিন্ধুদেশে, গুজরাতে, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে, বিহারে ও ভারতের বাহিরেও আছে। তাহার কারণ ইঁহাদের মধ্যে শাস্ত্রীয় ভাবের বন্ধন কম, মানবীয় ভাব একটু বেশী। কাশী-শাখা—বীজক ও তার বাঘেল-খণ্ডী টীকাই মানে। এই শাখা কবীর সাগর ও অন্যান্য গ্রন্থ ও বীজকের ত্রিজ্যা টীকা বেশী মান্য করে।

ধর্ম্মদাস

ধর্ম্মদাসের জন্ম বাংধোগড় নগরে। তিনি জাতিতে কসৌধন বাণিয়া। ভক্তরা বলেন ১৪৪৩ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি তাঁর জন্ম, বাল্যকাল হইতেই তিনি ভক্তিমান্, তখন মূর্ত্তিপূজা করিতেন। ইনি যখন যুবা, তখন মথুরায় কবীরের সঙ্গে দেখা হয়, তিনি তাঁর সকল ভ্রম দূর করিয়া এক সত্য পরমেশ্বরের প্রেমভক্তিতে ধর্ম্মদাসকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন, অমর সুখ-নিধানে সেই কথোপকথন লিখিত

আছে। ভারত ব্রাহ্মণের মত যদি গ্রহণ করা যায় তবে কবীরের মৃত্যুকালে ইঁহার বয়স শুধু ৫ বৎসর দাঁড়ায়।

ঘটরামায়ণ মতে কবীরের সঙ্গে তাঁর দেখা কাশীতেই হয়। সেইখানেই তিনি তাঁর মূর্ত্তিপূজার ভ্রম দূর করেন।

ধর্ম্মদাসের স্ত্রী ও জ্যেষ্ঠপুত্র চূড়ামণি দাসও কবীরের ধর্ম্মমত গ্রহণ করিলেন। ধর্ম্মদাস ধনী ছিলেন, তিনি সকল বৈভব বিতরণ করিয়া সাধনার জীবন গ্রহণ করিলেন।

ধর্ম্মদাসের মৃত্যুর পর নারায়ণ ও চূড়ামণি দাস এই সম্প্রদায়ের প্রধান হইলেন। ইঁহারা গুরু হইলেও বিবাহিত। ইঁহাদের পুত্ররাই পিতার গদীতে বসেন। তাই ইঁহাদের গদীকে বংশগদী বলে। এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইঁহাদের শেষগুরু দয়ানাম সাহেবের মৃত্যুতে এখন সম্প্রদায়ের রক্ষা লইয়া খুব গোলমাল চলিয়াছে।

ভগ্‌গু প্রবর্ত্তিত কবীর-পন্থের এক শাখা আছে ত্রিহুত জেলায় ধনৌলী গ্রামে। জগ্‌গূর মঠ উড়িষ্যার কটকে। জ্ঞানী সম্প্রদায়ের স্থান সাসারামের নিকট মঝ্‌নী গ্রামে। টকসারী সম্প্রদায়ের স্থান বরোদায়। নিত্যানন্দ কমলানন্দ ও চতুর্ভুজ কবীরের আজ্ঞায় ভক্তিস্থান দ্রাবিড়ে সাধনার্থ যান।

কবীরের পুত্র কমাল খুব বড় সাধক ও খুব উচ্চশ্রেণীর কবি ছিলেন। সাধুদের কাছে তাঁর দুই একটি পদ যাহা মিলে তাহা চমৎকার।

দাদূ

কবীর, কমাল, জমাল, বিমল, বুঢ়ন, এবং তাঁর শিষ্য (কোন কোন মতে কমালেরই শিষ্য) দাদূ। সুধাকর দ্বিবেদী মহাশয় মনে করেন, তাঁর জন্ম কাশীতে মুচী বংশে। অন্য মতে তাঁর জন্ম

গুজরাত আমেদাবাদে। তাঁর অনুবর্ত্তীরা প্রমাণ করিতে চান তিনি নাগর ব্রাহ্মণের বংশে জন্মগ্রহণ করেন।

তাঁর লেখায় দেখা যায়, তিনি জাতিতে তূলা-ধুনকর ছিলেন। এখন এ বিষয় জনগোপাল কৃত 'জীবন-পরচী' ও তেজানন্দ কৃত গ্রন্থ প্রভৃতি বহু গ্রন্থ দেখিয়া নিশ্চয় করিয়াছি যে তিনি মুসলমান ধুনকর ছিলেন। ধুনকর হিন্দু-মুসলমান দুই দলই ছিল। মুসলমানরাও ঐ হিন্দুশাখা হইতেই ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করে এবং শিক্ষা নাই বলিয়া সেইরূপই কুসংস্কারাচ্ছন্ন। কিন্তু নিজ প্রতিভায় সাধুসঙ্গ-গুণে ও সাধনায় তাঁর অসামান্য দৃষ্টি খুলিয়া যায়। তাঁর পূর্ব্ব নাম ছিল দাউদ। তাঁর স্ত্রীর নাম "হব্বা" বা (Eve)। তাঁর দুই পুত্র গরীব দাস ও মস্‌কীন দাস, দুই কন্যা নানী বাঈ ও মাতা বাঈ।

১৫৪৩ খ্রীঃ জন্মগ্রহণ করিয়া ১৬৬০ খ্রীঃ জৈষ্ঠমাসের কৃষ্ণাষ্টমী শনিবারে রাজপুতানা নরাণায় দাদূ দেহত্যাগ করেন। এখানেই এখন ইঁহাদের প্রধান মঠ।

মৈত্রীর সহিত সকল ধর্ম্মের একত্র মিলনের জন্য ইনি 'ব্রহ্মসম্প্রদায়' বা 'পরব্রহ্মসম্প্রদায়' স্থাপন করেন।

হিন্দু মুসলমান ও সকল ধর্ম্মকে এক উদার মৈত্রী ভাবের দ্বারা যুক্ত করিবার এক বড় আকাঙ্ক্ষা তাঁর ছিল। তাঁর বাণী যেমন গভীর তেমনি উদার। বাণীতে বারবার কবীরের গুণগান করিয়াছেন।

"তিনি শাস্ত্র মানেন নাই, আত্মানুভবকেই বড় মানিয়াছেন। অহমিকা ত্যাগ করিয়া এক ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া সকলকে ভাইবোনের মত দেখিবে ইহাই তাঁর উপদেশ। অন্তরেই

ভগবানের ধাম, প্রেমেই সেখানে তাঁহাকে পাওয়া যায়। ভক্তিতে ঈশ্বরের সহিত যুক্ত হইবে। তাঁর কাছে কিছু প্রার্থনা না করিয়া বরং তাঁর বিশ্বসেবার সঙ্গে নিজ সেবা মিলাইলে যোগ গভীরতর হইবে। সত্য—অজেয়, সত্য জীবনে লুকান যায় না। দুর্নীতি মলিনতা ত্যাগ করিয়া সরলভাবে তাঁর ইচ্ছার অধীন হইবে—ইহাই যোগ। নম্র, নিরভিমান, দয়ালু, সেবা-পরায়ণ হইবে। নির্ভয় হইবে, উদ্যমী বীর হইবে। সম্প্রদায়-বুদ্ধি ত্যাগ করিবে। তীর্থ, ব্রত, মূর্ত্তিপূজা, বাহ্য আচার ও চিহ্ন ধারণ সব ব্যর্থ। ক্ষমাশীল হইবে। ভগবদ্‌বিশ্বাসে দৃঢ় হইবে। সদ্‌গুরু মিলিলে সাধনা সহজ হয়। ইনি সহজভাবে খুব দৃঢ়-বিশ্বাসী ছিলেন। ইঁহার প্রার্থনাগুলি অতি মধুর ও গভীর। ইনি গৃহী ছিলেন এবং গৃহী হইয়া সাধনা করা পছন্দ করিতেন।”

ইঁহার লেখা ইঁহার শিষ্য জগন্নাথ ‘হড়ড়ে বাণী’ নামে সংগ্রহ করেন। শিষ্য রজ্জব ইঁহার লেখা ৩৭টি অঙ্গে এবং ২৭টি রাগে ভাগ করিয়া সংগ্রহ করেন। তাহা ছাড়া কায়াবেলী গ্রন্থও আছে। এই সংগ্রহের নাম ‘অঙ্গবন্ধু’।

ইঁহার আজ্ঞায় শিষ্যেরা নিজ সাধনার জন্য নানা সম্প্রদায়ের ভক্তদের লেখা একত্র করিতেন। জয়পুরে সাধু শঙ্কর দাসের কাছে তাঁর গুরুর ব্যবহৃত এক প্রাচীন বিশাল ভজনগ্রন্থ পাই। তাহাতে ৬৮ জন ভক্তের পদ আছে।

তাহাতে মুসলমান ভক্তেরও অনেক নাম আছে। যথা—

গরীব দাসজী

কাজী কাদমজী

সেখ ফরিদজী

কাজী মুহম্মদজী

সেখ বহাব়দজী

বখনাজী

রজ্জবজী

প্রভৃতি মুসলমান সাধকের পদ আছে।

গ্রন্থসাহেবে রামানন্দের একটি মাত্র পদ থাকিলেও এই গ্রন্থে রামানন্দের ৩টি পদ পাইয়াছি।

রজ্জবের সংগ্রহ 'সর্ব্বাঙ্গী' ও জগন্নাথকৃত সংগ্রহ 'গুণ-গঞ্জনামা' ভারতীয় সাধকদের নানা অপূর্ব্ব বাণীর সংগ্রহ।

ইহাঁর শিষ্যদের মধ্যে রজ্জবজী বখনাজী ওয়াজিন্দ খাঁ প্রভৃতি অনেকে মুসলমান।

আকবরের সঙ্গে তাঁহার ৪০ দিন ব্যাপী আলাপ হয়। তাহার বিবরণও ভক্তরা রাখিয়াছেন। তাহার পরই নাকি আকবর মুদ্রায় নিজের নাম না দিয়া একপীঠে "জল্লজুলালুহু" ও অন্য পীঠে "আল্লাহুআকবর" অঙ্কিত করেন। তাঁহার সময় আমেরের রাজা ছিলেন ভগবংত দাস।

দাদূর শিষ্যদের মধ্যে—

জগজীবনজী—দ্যৌসা নগরবাসী।

সুন্দর দাসজী (বড়)—বিকানীর রাজবংশে জন্ম।

সুন্দর দাসজী (ছোট)—দ্যৌসায় জন্ম, কবি।

ক্ষেত্রদাসজী।

রজ্জবজী—কবি ও সাধক, তাঁর স্থান সাঙ্গানের ও ফতহপুর।

গরীবদাসজী—দাদূর জ্যেষ্ঠপুত্র।

জাইসাজী।

মাধোদাসজী—যোধপুর, গুলরগ্রামবাসী।

প্রয়াগদাসজী বীহাণী—ভীড্‌রাণা ও ফতেহপুরে থাকিতেন।

বখনাজী।

বনওয়ারীদাসজী—উত্তরাধী শাখার প্রবর্ত্তক।

শঙ্করদাসজী—যোধপুর, বুশেরাগ্রামবাসী।

মোহনজী—প্রায়ই সাঙ্গানেরে বাস করিতেন।

মস্কিনদাসজী—দাদূর কনিষ্ঠ পুত্র।

জনগোপালজী—জয়পুর শেখাবাটীর আন্ধীগ্রামে মঠ।

জগন্নাথজী—দাদূর নিত্য-সঙ্গী, গুণগঞ্জনামার সংগ্রহকারী।

হরিদাসজী—নিরঞ্জনী।

নিশ্চলদাসজী—পরে বেদান্তী হন।

এই সব ভক্ত প্রত্যেকে এক এক জন দিক্‌পাল। সম্প্রতি রজ্জবের বাণী লইয়া আমি ব্যস্ত আছি। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রার্থনা ও বাণী দেখিয়া বলেন, 'জগতের কোন সাহিত্যে এমন গভীর ও মধুর প্রার্থনা দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।'

ইঁহাদের নাম দিলাম মাত্র। রজ্জবের কিছু পদ দিবার ইচ্ছা ছিল। স্থান ও কালের অভাবে দেওয়া অসম্ভব।

দাদূর সম্প্রদায়ে হিন্দু-মুসলমান উভয় শ্রেণীর লোক গৃহীত হইয়াছেন। মুসলমান বংশে জাত বহু গুরু দাদূ-সম্প্রদায়ে আছেন। এখনো দাদূর রজ্জব শাখায় হিন্দু বা মুসলমান যিনিই সাধনায় বড় হন তাঁহাকেই সকলে প্রাধান্য ও গুরুর স্থান দেন।

জয়পুর শীকরে, শেখাবাটীতে, খেতরীর অন্তর্গত চূড়ী গ্রামে, জয়পুর কালভৈরাতে, ভীরানীনগরে, জয়পুরের অন্তর্গত মাল্‌সীসরে, পাটিয়ালার অন্তর্গত নারনৌল নগরে এখনো রজ্জবের বহু

ভক্ত ও মঠাদি আছে। ইদানীং এই সম্প্রদায়ে অনেকে 'সাধু' অনেকে 'বিরক্ত'। সংসারীদের মধ্যে পণ্ডিত উপাধিধারীও অনেকে আছেন।

রজ্জব বলেন 'চারিদিকের অন্ধকারের মধ্যে যে দীপ আলোক দিবে, তাহা আমাদের অন্তরে।

অন্তর দীপ

দেহকে বৃথা কষ্ট দিয়া শুষ্ক বৈরাগ্যে তোমার অন্তরের শত্রু কি দমন করিতে পার? না কোন আলোক পাও?'

রজ্জব বলেন, 'জীবন মস্‌জিদের মধ্যে নমাজ ও প্রণতি পূর্ণ কর। মনই সেখানে মাঝে মাঝে নানা গোলমাল আনিয়া উপস্থিত করে। সেই শান্ত ভজনালয় হইতে এই কাফের মনকে বাহির করিয়া দাও।'

'জীবনের সব দিক্‌কে সব ভাবকে পূর্ণ করিয়া সাধনা পূর্ণ কর। বাঘ বিড়াল প্রভৃতি জন্তু কয়েকটি বাচ্চা প্রসব করে, তার দুই একটাকে প্রবল করিতে অন্যগুলিকে মারিয়া খাওয়ায়, তেমনি সাধনায় যদি একটি দুইটি ভাব পুষ্ট করিতে জীবনের অন্য ভাবগুলিকে বধ করা হয় তবে বাঘ-বিড়ালের সাধনাই হয়। দয়া পুষ্ট করিতে গিয়া কেহ যদি পৌরুষ নষ্ট করিয়া ক্লীব হইয়া যায় তবে সে সাধনার বলিহারী! বীরদের উপরেই সংসারের সব নূতন স্থষ্টির ভার। কাপুরুষেরা জগতে কি স্থষ্টি করিতে পারে?'

সাধনা—সর্ব্বাঙ্গীণ

'যত মনুষ্য তত সম্প্রদায়। এমন করিয়াই বিধাতা বৈচিত্র্য রচনা করিয়াছিলেন। অথচ সকলের সব প্রণতি মিলিয়া একটি মহা প্রণতিধারা হরিসাগরের দিকে চলিয়াছে।'

সাধনার বৈচিত্র্য

'নারায়ণের পদোদ্ভবা গঙ্গা। প্রতি ভক্তের হৃদয়ে যদি ভগবানের চরণ থাকে, তবে সকল হৃদয় হইতে একটি একটি ভাব-গঙ্গা বাহির হইতেছে। জগতের এই সকল গঙ্গাকে মিলিত করিয়া যে মহাতীর্থ, সেখানে স্নানেই মুক্তি।'

প্রতি হৃদয়-গঙ্গা মিলনে মহাতীর্থ

'প্রতি বিন্দুতে সিন্ধুর ডাক আছে। তবু একলা একটি বিন্দু সাগরের দিকে রওয়ানা হইলে পথেই সে শুকাইয়া মরিবে। সকল বিন্দু একত্র হইলে যে ভক্তির গঙ্গা হয় তাহাতে পথের সব বাধা ও শুষ্কতা দূর হইয়া যায়। জগতের সকল ভাবের ধারা একত্র করিয়া মানবের সব শুষ্কতা দূর কর।'

বহু বিন্দু মিলনে ধারা

'সকল বসুধাই বেদ, পরিপূর্ণ সৃষ্টিই কোরান। কতকগুলি শুষ্ক কাগজের সমষ্টিকে পরিপূর্ণ জগৎ মনে করিয়া পণ্ডিত ও কাজীরা ব্যর্থ হইতেছেন। সাধকের অন্তরই কাগজ। তাহাতে প্রাণের অক্ষরে সকল সত্য দীপ্যমান; সকল হৃদয়ের মিলনে যে বিরাট্ মানব ব্রহ্মাণ্ড তাহাতে পরিপূর্ণ বেদ কোরান ঝলমল করিতেছে। বাহিরের কৃত্রিমতার বাধা দূর করিয়া সেই প্রাণ-কোটী-ব্রহ্মাণ্ডের সত্য পড়িয়া দেখ; মৃত কাগজে প্রাণহীন অক্ষরের পাঠকই জগতে দেখা যায়। জীবনে জীবনে যে প্রাণময় বেদ, হে রজ্জব, পড়িতে হইলে তাহাই পড়।'

বসুধা—বেদ
অন্তর—কোরান

প্রাণ-কোটী-ব্রহ্মাণ্ড

কবি সুন্দরদাসের প্রধান ৫ শিষ্য। শ্যামদাসজী, দামোদরদাসজী, দয়ালদাসজী, নির্ম্মলদাসজী, নারায়ণদাসজী। এই

রকম প্রত্যেকেরই শিষ্যক্রমে অনেক বড় বড় ভাব ও চিন্তার নেতা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

কবীরের মতবাদ রাজপুতানা, পাঞ্জাব, সিন্ধু দিয়া ক্রমে কাঠিয়াওয়াড় ও গুজরাত গিয়া পৌঁছিল।

গুজরাতে উদা

যখন কবীর-সম্প্রদায় গুজরাতে পৌঁছিল, তখন তাঁর নাকি সেখানে ১২ শাখা। তার মধ্যে সত্য-কবীর, নাম-কবীর, দান-কবীর, মঙ্গল-কবীর, হংস-কবীর, উদা বা উদাসী-কবীর প্রভৃতি সম্প্রদায়। গুজরাতের দিকে কবীর-পন্থের সৎকবীর শাখা অনেকটা উদার রহিল, কিন্তু উদা সম্প্রদায় অত্যন্ত আচারবিচার-পরায়ণ ও অত্যধিক শুচিতাগ্রস্ত। নিজেদের সম্প্রদায়ের লোক ছাড়া ইহারা কাহারও উনন, বাসন, এমন কি জলপানের ঘটীও ব্যবহার করে না, মাজিয়া দিলেও না। এমন কি, ভিন্ন সম্প্রদায়ের স্বজাতীয় বা উচ্চজাতীয় লোকের 'ভাণ্ডবাসন' বা ছোঁয়া জিনিষ বা জল ইহারা ব্যবহার করে না। সুরত ভরুচ প্রভৃতি দিকে, বরোদা, ছোট উদয়পুর প্রভৃতি রাজ্যে উদাপন্থী আছে, তাহাদের ছেলেরা এই শুচিতার জন্য কোন বিদ্যালয়ে গিয়া লেখাপড়া করিতে পারিতেছে না। কবীরের কোন উচ্চ ভাব বা আদর্শ আজ ইহাদের মধ্যে নাই। ভারতে পূজ্য হইবার সহজ পন্থা এই শুচিতাবাদ মাত্র ইহাদের এখন একমাত্র সম্বল।

কাঠিয়াওয়াড়ে কবীরের যে শাখা তাঁহার জীবন্ত ভাব ও উদারতা লইয়া কাজ করিতেছিল, তাহার প্রধান নেতার নাম ভান সাহব। তাঁহার সময় আনুমানিক ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দ।

কাঠিয়াওয়াড় শাখা

তিনি জাতিতে লোহাণা। কন্‌খিলোড় গ্রাম হইতে তিনি বারাহী গ্রামে যাইয়া বাস করেন। তাঁর পিতার নাম কল্যাণ, মায়ের নাম অম্বা। ইনি সৎকবীর-সম্প্রদায়ের লোক।

ভান

তাঁর শিষ্যদের মধ্যে কুবঁরজী, রবিদাসজী, শ্যামদাসজী, শঙ্করদাসজী, মাধবদাসজী, চরণদাসজী, দয়ালদাসজী, গরীব-দাসজী, কৃষ্ণদাসজী খুব প্রধান স্থানীয় ছিলেন। তাঁর পুত্র ক্ষেমদাসজীও প্রসিদ্ধ সাধক ছিলেন। কিন্তু বোধ হয় সব চেয়ে শক্তিশালী ছিলেন তাঁর অন্ত্যজ-জাতীয় শিষ্য জীবনদাসজী ও ত্রিকমদাসজী—ভান বলিতেন এই মণ্ডলকে লইয়া আমি দেশের সর্ববিধ দুর্গতি ও হৃদয়ের অন্ধকার জয় করিব। তাই লোকেরা এই মণ্ডলকে ঠাট্টা করিয়া বলিত "ভান ফৌজ" বা ভানের সৈন্যদল।

রবিসাহব ছিলেন জাতিতে বণিক্, একজন ঋণীর বাড়ী তাগাদা করিতে আসিয়া ভান সাহবকে তথায় দেখেন ও তাঁর প্রভাবে তাঁর কাছে ধর্ম্মদীক্ষা গ্রহণ করিয়া নবজীবন প্রাপ্ত হন।

রবিসাহবজী

ভানের অষ্টপদে সংসারের অনিত্যতা, নিরঞ্জন বিভু ভগবানের সর্ব্বব্যাপিত্ব প্রভৃতি কবীর-মতের কথাই বেশী।

তাঁর মৃত্যুর সম্বন্ধে কথা আছে যে ভগবানের নামে তিনি আপনাকে নিমজ্জিত করিয়া দিয়াছিলেন।

কাঠিয়াওয়াড়ের লাখনকার ভক্ত বাবা মোহনদাসের মতে কবীর-মতের সাধক লৌলংগ্রীর শিষ্য ভান সাহব। লৌলংগ্রীর অন্য শিষ্য আংবো ছট্টোর স্থান এখন দুধরেজ।

ভানের পুত্র ক্ষেমদাসজী, তাঁর শিষ্য অন্ত্যজ ভক্ত ত্রিকমজী ও অন্ত্যজ জীবনদাসজী তাঁর শিষ্য।

ভানের শিষ্য রবিসাহব, তাঁহার শিষ্য মোরার। মোরারের স্থান মোরার খম্বালিয়া কাঠিয়াওয়াড়ে ভক্তদের একটি প্রধান তীর্থস্থান।

অনেকের মতে ভানের শিষ্য ভীমভকত। তাঁর শিষ্য ঢেঁড় জাতীয় জীবনদাসজী। গোণ্ডালের নিকট ঘোঘা-বদর তাঁর স্থান। তাঁহার চামড়া ভিজাইবার কুণ্ডটি এখন ভক্তদের একটি তীর্থস্থান। জীবনের শিষ্য কড়িয়া ( রাজমিস্ত্রী ) জাতীয় প্রেমদাসজী, চারিক্রোশ দূর হইতে প্রতি রাত্রে জীবনদাসের কাছে আসিয়া ভগবৎপ্রসঙ্গ ও ভক্তিকথা শুনিতেন। গুরু বর দিতে চাহিলে, তিনি প্রেম-ভক্তি বর চান। গুরু বলিলেন, "তাহা তো তোমার পূর্ব্ব হইতেই আছে।" তখন প্রেমদাস বলিলেন, "তুমি যাহা ভাল মনে কর তাহাই দাও।" গুরু বলিলেন, "আমার তো বংশ নাই। তোমার বংশ দিয়াই আমার সাধনার ধারা চলিবে।" প্রেমের কন্যা ছিল, পরে তাঁর পুত্রও হয়। সেই ধারাই এখন গুরু।

অন্ত্যজ জীবনদাসজীর এক শিষ্য ছিলেন রাজপুত জাতীয় অর্জ্জুনদাসজী। তিনিও সমর্থ সাধক ছিলেন। ইঁহাদের গান ভক্তদের মধ্যে খুব আদৃত। সে সব দেশে ভজনীয়ারা তাহা ভক্তি-ভরে গান করেন। স্থানাভাবে তাহার নমুনা দেওয়া গেল না।

জুনাগড় লাইনের বনথলী ষ্টেশন হইতে ৩ ক্রোশ দূরে মোরার সাহবের খম্বালিয়া। গণ্ডালে দেবপাড়ায় জীবনদাসজী

ভজনীয়ার স্থান। বাঁকানেরে রবিসাহব-সম্প্রদায়ের সাধক রতনদাসের স্থান। এখানে অনেক কড়িয়া জাতীয় ভক্ত আছেন। রাঢরানের নিকট দুধরেজে কড়িয়া ভক্তের মঠ। কচ্ছ বাগড়ে, মালিয়া শাহপুরে, ধ্রাংগধ্রায় এই সব ভক্তদের অনেক মঠ আছে।

ভাবনগর প্রভৃতি স্থানে কাঠিয়াওয়াড়ে কবীরপন্থী আছেন। কিন্তু তাঁরা প্রায় সেই সব দেশেরই শাখার ভক্ত।

কবীরের প্রভাব

দাদূর সকল শাখা-প্রশাখা ছাড়াও কবীরের প্রভাব আরও নানা শাখায় ভারতের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িল।

কবীরের শিষ্য জ্ঞানীদাস কয়েকটি সাধক সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক।

জ্ঞানী মার্গী

কাঠিয়াওয়াড়ের মার্গী সম্প্রদায় বলেন, নিত্য সাধনার মার্গে থাকাই সত্য সাধনা। সাধনায় অবসান অর্থাৎ সিদ্ধি বলিয়া কিছু নাই। তাঁহারা গৃহস্থ সাধক।

মূলপন্থী মত প্রবর্ত্তন করেন সাহীবদাস। বাবালাল সম্প্রদায় পঞ্জাব ও মলৱায় আছে। ইঁহারাও কবীরের সত্যের কাছে ঋণী। দারাশিকোহের সঙ্গে বাবালালের আলাপের কথা পরে বলা হইবে।

সাধ সম্প্রদায় আছে ফরক্কাবাদে। তাঁহারাও কবীরের ভাবে সাধনা করেন।

জগজীবনের সৎ-নামী সম্প্রদায়, গাজীপুরের শিবনারায়ণী সম্প্রদায়, চরণদাসী, পল্‌টুসাহেবী, মলুকদাসী, প্রাণনাথী, দরিয়া সাহিবী প্রভৃতি সম্প্রদায় কবীরের ভাবেই ভাবিত।

এইগুলি পরে ক্রমে বলা যাইতেছে।

তবে কবীরের মতবাদ প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে বাংলা ও উড়িষ্যায় নাথ-পন্থ ও নিরঞ্জন-পন্থের প্রচার ছিল। পরে উড়িষ্যায় মহিমাপন্থ ও কুম্ভীপটিয়া মতবাদ প্রবর্ত্তিত হয়। উড়িষ্যায় কুম্ভীপটিয়া মত মুকুন্দদেব কর্ত্তৃক স্থাপিত। ইঁহারা মূর্ত্তি, মন্দির ও ব্রাহ্মণের শাসনবিরোধী। জাতিবিশেষের শ্রেষ্ঠতা ইঁহারা মানেন না। একবার ইঁহারা জগন্নাথদেবের মন্দির ভাঙ্গিয়া দিতে গিয়াছিলেন। এই মতবাদের সঙ্গে কবীর বা পশ্চিমের সাধকদের অনেক মিল থাকিলেও ইঁহারা একেবারে ঐ সাধনা হইতে স্বাধীন ভাবে অগ্রসর হইয়াছেন।

উড়িষ্যার পন্থ

উড়িষ্যায় অনন্তকুলীরা যে কোনো জাতির কন্যা বিবাহ করেন ও সকল জাতির সঙ্গে বসিয়া পংক্তি ভোজন করেন।

উড়িষ্যায় বিন্দুধারীদের মধ্যে যে কোনো জাতির শিষ্য হইতে পারা যায়। গুরু জ্ঞানী হইলেই হইল।

বাংলা দেশের খুসীবিশ্বাসী, সাহেবধনী, রামবল্লভী, জগমোহনী, বলরামী, ন্যাড়া, সহজী, আউল, বাউল, দরবেশ, সাঙ্গঁ, সংযোগী, যন্ত্রপতিয়া, কর্ত্তাভজা প্রভৃতি দলের উপর বাংলা মগধের সহজমত, নাথমত, নিরঞ্জন-মতের প্রভাব যথেষ্ট; মুসলমান ভাব ও সাধনাও অনেকটা আছে। কবীর-দাদূ প্রভৃতির শিক্ষাও কিছু কিছু আসা অসম্ভব নহে। এ সব সম্প্রদায় বাংলা দেশের, কাজেই আপনাদের কতকটা জানার কথা। 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ে' অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় ইঁহাদের পরিচয় দিয়াছেন,

বাংলার পন্থ

তাই এখন আর কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। ইঁহারা জাতি পংক্তি, প্রতিমা ও শাস্ত্র মানেন না। হিন্দু বা মুসলমান বলিয়া'ও ইঁহাদের কোনো বাদবিবাদ নাই।

সিন্ধুদেশ

সিন্ধের সূফীদের নাম পূর্ব্বে করা হইয়াছে বলিয়া এখানে আর তাঁদের নাম করিলাম না। নহিলে এখানে তাঁদের নাম করা উচিত ছিল।

নব সূফীবাদ

এখানে উত্তর-পশ্চিম ও দিল্লী প্রদেশের হিন্দু-মুসলমানে মিলিয়া যে এক রকম নূতন সূফী মত গড়িয়া তুলিয়াছিলেন তাঁহাদের নাম করা উচিত।

বাররী

য়ারী

দিল্লীতে বাররী (১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি) সাহব নামে এক সূফী সাধক ছিলেন। তাঁর শিষ্য ছিলেন বীরু সাহব। তিনি জন্মতঃ হিন্দু। তাঁর শিষ্য হন সূফী ভক্ত য়ারী শাহ। ইঁহার সময় আনুমানিক ১৬৬৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দ।

মুসলমান হইলেও ইঁহার রচনায় আল্লার সঙ্গে রাম, হরি, আরতি, দেহতত্ত্ব, শূন্যতত্ত্ব প্রভৃতি গভীর ভাব বিদ্যমান। হিন্দু বা মুসলমানের কোন সঙ্কীর্ণতাই ইঁহার নাই। ইঁহার গানে গুরুর চরণ রজের অঞ্জন দিবার কথা আছে। সৃষ্টি হইল শূন্যের কাগজে তাঁর প্রেম কলমের লেখা। যে এই রস প্রত্যক্ষ করে নাই, তাহাকে যুক্তিদ্বারা বুঝান অসম্ভব। মানব ব্রহ্মসাগরেরই বুদ্‌বুদ্—ইত্যাদি কথা চমৎকার পদে রচিত আছে।

য়ারীর শিষ্য বুল্লা সাহব, সুফী শাহ, সেখন শাহ, হস্ত মুহম্মদ শাহ ও কেশবদাস। কেশবদাসের সময় আনুমানিক ১৬৯৩ হইতে ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দ।

কেশবদাস

কেশবদাসের পদ বিশেষতঃ তাঁর অমী ঘুঁট বা অমৃত পান সাধকদের মধ্যে সমাদৃত। তিনি সাধক য়ারীর কাছে অজপা মন্ত্র পাইয়া নিজকে ও নিজের জীবনকে ধন্য মানিয়াছেন। সেই সাধনার বলে জগতকে নূতন দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন। কেশব বলিতেছেন, 'কোটি ব্রহ্মা-বিষ্ণুর যে রস ধোয় সেই অমৃত রস আর আমার মধ্যে ধরিতেছে না।

সেই ভগবানের স্বরূপে দৃষ্টি খুলিয়া গিয়াছে। এখন আর সৌন্দর্য্য-শোভা বিশ্বে ধরিতেছে না।

সকল সংশয়-দ্বিধা ভাসাইয়া দিয়া সেই ভগবানের চরণে লুটাইয়া পড়াই হইল সাধনা।'

ইনি জাতিতে কুনবী বা চাষী। ইনি য়ারীর শিষ্য ও কেশবদাসের সমসাময়িক। ইনি প্রথমে ইঁহার শিষ্য গুলাল সাহেবের চাষী দাস ছিলেন। চাষ করিতে গিয়া ইনি ধ্যানে মগ্ন থাকিতেন। এই কথা শুনিয়া গুলাল রুষ্ট হন। একদিন আসিয়া দেখেন, বুল্লা কাজে ফাঁকি দেন নাই, তিনি হালের উপর দাঁড়াইয়া কাজ করিতেছেন। তবে তাঁর মন কোন এক অতীন্দ্রিয় লোকে। গুলাল একটু লজ্জিত হইলেন। বুল্লা কহিলেন, "তুমি দেহের প্রভু, দেহ তোমার কাজ করিতেছে। হৃদয় মন রহিয়াছে হৃদয়েশ্বরের কাছে।" ইঁহার প্রেমভক্তির পরিচয় পাইয়া গুলাল ইঁহার শিষ্য হন। ইঁহার প্রার্থনা, ব্রহ্মাস্তব,

বুল্লা

অসীম রসপানানন্দ-বর্ণনা, মুক্তির খেলা, আরতি, স্তব প্রভৃতি চমৎকার।

ইঁহার লেখায় পাই—পূরব দেশের এক ব্রাহ্মণ অবধূত ইঁহার অঙ্গনে আসিয়া ইঁহাকে পরব্রহ্মরসে, পরমতত্ত্ব পূজায় সহজ অসীমতত্ত্বের গানে মাতাইয়া গেলেন।

গাজীপুরের ভুরকুড়ায় ইঁহার সাধনার স্থানে এখনো মঠ বিদ্যমান।

গুলাল সাহব

ইনি বুল্লার শিষ্য, গুরুর প্রায় সমবয়সী, তবে গুরুর আগেই মারা যান, ইনি জাতিতে ছত্রী: পূর্ব্বে ধনী ছিলেন—সাধনার গুণে ইঁহার সব অভিমান যায়। ইনি গাজীপুর বসহরি তালুকের জমীদার ও গৃহস্থাশ্রমী ছিলেন। ইঁহার উপদেশবাণী ও আত্মজাগরণের পদ খুব গভীর ও মধুর। ইঁহার প্রার্থনা ও প্রেমপদ বড়ই হৃদয়-স্পর্শী। আরতি, রেখ্‌তা হোলী, বসন্ত, বারমাসা, হিংডোলা প্রভৃতিতে রচিত ইঁহার বাণী আদৃত। ব্রহ্মযোগের কথা ইনি অতি সুন্দরভাবে লিখিয়াছেন।

জগজীবন

বুল্লার আর এক শিষ্য হইলেন জগজীবন সাহব। ইঁহার জ্ঞানপ্রকাশ গ্রন্থ-রচনার কাল ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দ। গ্রীয়ারসনের মতে তাঁর জন্ম ১৬৮২ খ্রীঃ। তিনি কবীরপংথী।

ইনি জাতিতে চংদেল ছত্রী। সরযূ নদীতীরে বরাবাংকী জেলার সরদহা গ্রামে ইঁহার জন্ম। বালককালেই বুল্লা সাহবের সঙ্গে তাঁহার দেখা হয়, তখনই ইনি তাঁর শিষ্য হইতে চান। বুল্লা বলিলেন, "কানে মন্ত্র দিবার প্রয়োজন কি?"

তবু তাঁর সংস্পর্শে ও দয়াতে জগজীবনের জীবন বদলাইয়া গেল। তাঁহার হৃদয় জাগ্রত হইল।

জগজীবন যে সাধনার পথ প্রবর্ত্তন করেন, তাহাকে সত্যনামী বা সৎনামী বলে। গ্রামের লোক অত্যন্ত বিরুদ্ধতা করিলে ইনি সরদহা ছাড়িয়া দুই ক্রোশ দূরবর্ত্তী কোট্‌রা গ্রামে গিয়া বাস করেন।

সৎনামী

জগজীবন গৃহী ছিলেন, গোণ্ডার রাজার পুত্রের সঙ্গে ইঁহার কন্যার বিবাহ হয়।

জগজীবনের 'জ্ঞানপ্রকাশে', 'প্রথম-গ্রন্থে' ও 'আগম-পদ্ধতিতে' হরপার্ব্বতীর কথাবার্ত্তার প্রণালীতে রচিত উপদেশ। 'প্রেম-গ্রন্থে' প্রার্থনা ও সাধনার কথা। 'মহাপ্রলয় গ্রন্থে' ভক্তের ও ভক্তির স্বরূপ বর্ণনা আছে। ইঁহার 'অঘ-বিনাশ' প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

ভগবানের কৃপাই যে শ্রেষ্ঠ সাধনা, তাহাই তিনি বলিয়াছেন ও সুনীতি সহজ জীবনের উপদেশ দিয়াছেন। তাহাতে লোকে পাগল বলে বলুক; হিন্দু-মুসলমানকে মৈত্রীতে ও সাধনার যোগে একত্র হইতে বলিয়াছেন।

তাঁর শিষ্য দুলমদাসজী, জলালীদাসজী ও দেবীদাসজী লিখিত বাণীগুলি খুব সুন্দর। কবীরের মত ইঁহার কিছু হেঁয়ালী আছে। অনেক প্রার্থনাও ইঁহার আছে। ইঁহার অনেক শিষ্য নিম্ন জাতীয় ভক্ত, ও একাধিক শিষ্য মুসলমান।

ইঁহার শিষ্য দুলমদাসের স্থান ছিল রায়বেরিলী জেলায়। ইঁহার রচিত আত্মতত্ত্ব, সাধনা, পবিত্রতা, ভক্তি ও ভগবৎকৃপা বিষয়ক পদগুলি বেশ গভীর।

দুলমদাস

এই সৎনামী সম্প্রদায়ের পূর্ব্বে আওরংজেবের বিরুদ্ধে (১৬৭২ খ্রীঃ) এক সৎনামী সাধ সম্প্রদায় দাঁড়াইয়াছিল। তাঁহারা নিজকে সাধ বলিতেন। তাঁহারা রবিদাস হইতে আগত এক শাখা।

সৎনামী সাধ

১৭৫০ খ্রীঃ সৎনামী সম্প্রদায় আবার সংস্কৃত হইয়া পুনর্গঠিত হয়।

বীর ভানের সাধ সম্প্রদায় ১৬৫৮ খ্রীঃ স্থাপিত হয়। ইঁহার বাণী অনেকটা দাদূ ও কবীরের বাণীর সঙ্গে মেলে। নানকের আদি গ্রন্থের নামে তার নাম আদি উপদেশ। উহাতে শব্দ ও শাখী দুইই আছে। বীর ভানের গুরু ছিলেন একজন ব্রহ্মবাদী সিদ্ধ পুরুষ।

১৮২৫ খ্রীঃ হইতে ১৮৩০ খ্রীঃ মধ্যে ভক্ত চামার ঘাসীদাস একটি সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন করেন। তাহার নাম সৎনামী। ইহা ছত্রিশগড়ের দিকে খুব প্রবল হইয়া উঠে। ইহাদের ভক্তরা সব চামার শ্রেণীর।

সৎনামী ঘাসীদাসী চামার

ইঁহারা প্রায়ই ক্ষেত্রের চাষের ভৃত্য। গিরোড্ গ্রামে ইঁহাদের প্রধান স্থান। ঐ স্থানটি পূর্ব্বে বিলাসপুর জেলায় ছিল, এখন রায়পুরে।

১৯০১ খ্রীঃ ইঁহাদের সংখ্যা দেখা যায় চারি লক্ষ। ইঁহারা মাছ, মাংস ও মদ্য স্পর্শ করেন না। জগজীবনী সৎনামীদের মত বেগুনও ইঁহাদের ত্যাজ্য। ইঁহারা মূর্ত্তি ও প্রতিমা পূজা ত্যাগ করিয়াছেন।

ইঁহারা ব্রাহ্মণের প্রাধান্য মানেন না। নিজেরা যদিও

চামার তবু উচ্চতর বর্ণের বর্ণগত শ্রেষ্ঠতা মানেন না। ইঁহাদের মতে শ্রেষ্ঠতা চরিত্রে, ভক্তিতে ও পবিত্র আচরণে।

অলখ্‌গির চামার লালবেগী

চামার জাতি সাধকদের কথা বলিতে গেলে লালবেগ বা লালগিরের নাম করিতে হয়। ইঁহারা নিজেদের অলখ্‌নামী বা অলখ্‌গিরও বলেন। দশনামীদের মত ইঁহারা "গিরি" উপাধী লইয়াছেন। ইঁহারা বলেন, তুলসীদাসের পূর্ব্বের এই মত। বিকানীরে ইঁহাদের খুব প্রভাব। ইঁহারা প্রতিমা পূজা করেন না। অলখ পরমেশ্বরের ধ্যান ও সাধনা করেন। হিংসাত্যাগ, দান, পবিত্রতাই ধর্ম্ম। পরলোকের দুশ্চিন্তা ছাড়িয়া সাধনা করিলে ইহলোকেই পূর্ণানন্দ লাভ হয়—ইহাই ইঁহাদের মত।

ইঁহাদের মতে স্বর্গ নরক প্রভৃতি ভবিষ্যৎ ভাবনা নিরর্থক। স্বর্গ নরক সবই নিজের মধ্যে। বর্ত্তমানের মধ্যেই অনন্ত ভবিষ্যৎকে সাধনায় অনুভব করিতে হইবে। সাধনারদ্বারা ইহলোকেই পূর্ণানন্দ অনুভব করাই পরমপুরুষার্থ।

ইঁহাদের সাধুরা কম্বলের আলখাল্লা ও টুপী ধারণ করেন। পরস্পরে 'অলখ কহো' বলিয়া সম্ভাষণ করেন। উচ্চজাতিদের উচ্চতা ইঁহারা মোটেই মানেন না, এই বিষয়ে ইঁহারা উড়িষ্যার অপ্রাচীন পন্থ কুম্ভীপটিয়াদের (১৮৫০ মুকুন্দদাস) মত। মন্দিরে ইঁহাদের প্রবেশ নাই বলিয়া ইঁহারা বলেন মন্দির প্রভৃতি হীনস্থানে গেলে সত্যভ্রষ্ট হইতে হয়।

ইঁহাদের সাধুরা অতি শান্ত ভাবে ভিক্ষা করেন, না দিলে অতি শান্ত ভাবে চলিয়া যান।

এইমতের সাধুরা নির্ম্মল শান্তচিত্ত যোগী বলিয়া সাধারণের কাছে সম্মানিত। ইঁহাদের মতে চিন্তায়, বাক্যে, সেবায়, অর্থে, সর্ব্বতোভাবে পরোপকার করা প্রত্যেকের পক্ষে কর্ত্তব্য।

উত্তর-পশ্চিমে এই সম্প্রদায়ীরা বলেন ইঁহাদের গুরু লালবেগ হইলেন স্বয়ং শিবরূপ।

স্বর্গ বা ভবিষ্যতের লোভের দ্বারা চলিত হওয়াকে ইঁহারা ঘৃণা করেন। সাধনার লক্ষ্য হইল পবিত্র শান্ত সমাহিত হইয়া ইহলোকেই পূর্ণানন্দ অনুভব করা। বর্ত্তমানই হইল তিনকালের সার। অনন্ত কালের পরমানন্দ রস নিঙ্গড়াইয়া বর্ত্তমানের পেয়ালা ভরপূর করিয়া পান করাই ইঁহাদের সাধনা।

ভীখা হইলেন গুলাল সাহবের শিষ্য। আজমগড় জেলায় খানপুর বোহনা গ্রামে ১৭২০ খ্রীঃ-র কাছাকাছি উচ্চ ব্রাহ্মণ কুলে ইঁহার জন্ম।

ভীখা

ধর্ম্মের পিপাসায় ইনি কাশী যান। সেখানে কিছু না পাইয়া গুলাল সাহবের নাম শুনিয়া তাঁর কাছে যাইয়া তৃপ্ত হন। তিনি মুসলমানের শিষ্য ধারায় দীক্ষিত, ইহা জানিয়াও ব্রাহ্মণ ভীখা তাঁহার কাছে দীক্ষা নেন। তাঁর নিজের লেখাতেই এসব কথা আছে।

বুল্লার সাধনা স্থান ভুরকুড়াতে গুলাল থাকিতেন। ইনিও সেখানেই রহিলেন ও দেহত্যাগ করিলেন। গুরুর মৃত্যুর পর ইনিই সকলকে উপদেশ দিতেন।

এই ভীখার শিষ্য গোবিন্দ সাহব। ইনি ফৈজাবাদ অহিরৌলীর অধিবাসী ছিলেন।

গোবিন্দের শিষ্য পল্‌টু সাহব। গাজীপুর ও বালিয়া জেলায় তাঁহার বহু অনুরাগী সাধক আছেন।

তাঁহার বাণীতে দেখা যায়, 'শাস্ত্র ব্যর্থ, প্রেমেই সাধনা।' ইনি বলেন, 'নিরভিমান হইয়া সাধক প্রেমে সহজ হইবে, বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত হইবে। ভাবের দ্বারা সকল চরাচর পূর্ণ; যেদিন সত্য দৃষ্ট হয়, সেদিন সর্ব্বত্র শোভা; সেদিন আর ভেদ নাই। তখন বাহির-ভিতরের ঝগড়া মিটিয়া জীবন সার্থক হয়।' ইঁহার অনুতাপ ও প্রার্থনা বাণী খুব সুন্দর।

গোবিন্দের শিষ্য পল্‌টুকে অনেকে দ্বিতীয় কবীর বলেন। কবীরের ভাবের সঙ্গে তাঁর ভাবের গভীর মিল আছে। ইনি শাহ আলমের সময় জীবিত ছিলেন। ফৈজাবাদ জেলার নগপুর-জলালপুর গ্রামে বাণিয়া বংশে ইঁহার জন্ম। ইনি গৃহী ছিলেন। ইঁহার বংশীয় লোক এখনো ঐ গ্রামে আছেন। গ্রামের লোকেরা সারাজীবন তাঁহাকে জ্বালাইয়া মারিয়াছে। ইঁহার লেখায় দেখি—তাঁহার সময় পেটের দায়ে সন্ন্যাসী ঢের ছিলেন। অনেক বৈরাগী তখন রীতিমত ব্যবসায় করিতেন।

পল্‌টু সাহব
(প্রায় ১৭৫৭-১৮২৫)

ইঁহার কুণ্ডলিয়া ছন্দে কাব্য খুবই চমৎকার ভাষায় লেখা।

পল্‌টু বলেন, 'নীচ জাতিকে নষ্ট করিল উচ্চ জাতিরা, এবং নিজেরাও নষ্ট হইল। যে সত্যকে দেখিয়াছে তার আর দেশবিদেশ নাই। প্রত্যক্ষ সত্য বড় সত্য নহে, অন্তরে দেখা সত্যই বড়। সাধকের সংযম ও বীর্য্য চাই। ভগবান্ কোন সম্প্রদায়-বিশেষের সম্পত্তি নহেন। জাতি-পংক্তির ক্ষুদ্র পরিচয় ছাড়। নম্রতায় দোষ নাই। মধুর হও, সেবাব্রত হও।

সহজ সত্যকে সহজ না হইলে পাওয়া যায় না। সত্য আছে অন্তরে—বাহিরে খোঁজা বৃথা।

যে মানবের মধ্যে দেবতাকে না দেখিল সে মন্দির হইতে দেবতাকে নির্ব্বাসন দিল।

ইঁহার মতাবলম্বী লোক বিস্তর। ভারতের সর্ব্বত্র এই সম্প্রদায়ের সাধক আছেন।

সৎনামী বলিয়া পরিচয় না দিলেও দরিয়া সাহেব ভগবানকে সত্যনাম বলিয়া ঘোষণা করিতেন। সেইজন্য সৎনামীদের কথা ও সৎনামী জগজীবনের পরবর্ত্তী ভক্তদের কথার পরই সত্যনামভক্ত বিহারী দরিয়া সাহেবের কথা বলা যাইতেছে।

সত্যনামভক্ত দরিয়া সাহেব (বিহার)

উজ্জয়িনী-রাজবংশীয় এক ক্ষত্রিয়-ধারা বক্সারের কাছে জগদীশপুরে আসিয়া রাজত্ব করেন। সেই বংশে ভক্ত সাধক পীরন শাহ জন্ম-গ্রহণ করেন। তাঁর পুত্র দরিয়া সাহেবের জন্মস্থান তাঁর মাতুলালয় ধারকান্ধা গ্রামে। ধারকান্ধা ডুমরাওয়ের ৭ ক্রোশ দক্ষিণে আরা জেলায়। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে ভাদ্রকৃষ্ণ চতুর্থীতে তাঁর তিরোভাব। কাজেই সম্ভবতঃ ১৭০০ খ্রীঃ তাঁর জন্মকাল। তাঁর মাতা মুসলমান দরজী-বংশীয়া।

ক্ষত্রিয় রাজকুলসম্ভব পীরন শাহ রাজরোষ হইতে ভাইদের বাঁচাইতে গিয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন, এই কথা সুধাকর দ্বিবেদী মহাশয় বলেন, ভক্তরা এ কথা মানেন না। জ্ঞানদীপক গ্রন্থে দরিয়া সাহেব নিজ জীবনের কথা কিছু কিছু দিয়াছেন, তাহাতেও একথা নাই।

যতদূর বুঝা যায়, সূফীসাধনায় আকৃষ্ট হইয়া পীরন শাহ সূফী হন। তখনই তাঁর নাম হয় পীরন শাহ। তাঁর পুত্রের উপর কবীরের প্রভাবই বেশী, অল্প বয়সে তাঁর বিবাহ হয় এবং যুবা বয়সেই ভক্তিভাব প্রকাশ হয়। ৩০ বৎসর বয়সে তিনি উপদেশ দিতে আরম্ভ করেন।

ইঁহারা মুসলমানদের মত দাঁড়াইয়া নত হইয়া প্রভুর কাছে প্রার্থনা করেন। তাহাকে ইঁহারা কোর্‌নিশ্‌ বলেন। মুসলমানদের মত বসিয়া যে প্রার্থনা করেন, তাহার নাম শির্‌দা বা শিজ্‌দা।

ইঁহারা লিখিত কোন শাস্ত্র, ব্রত, তীর্থ, আচার, বাহ্য নিয়ম, ভেখ, মন্ত্র প্রভৃতি মানেন না। মূর্ত্তি বা অবতারের পূজা ইঁহারা করেন না, জাতিভেদ মানেন না। জীবহিংসা, মদ্যপান, মৎস্য-মাংস-ভোজন প্রভৃতি ইঁহাদের নিষিদ্ধ। এই পন্থের সাধুরা মাটীর বদ্‌নার মত কমণ্ডলু বা ভরুকা ব্যবহার করেন। ইঁহার ৩৬ জন প্রধান শিষ্য ছিলেন। দিল্‌দাস সর্ব্বাপেক্ষা সমর্থ সাধক ছিলেন। ইঁহাদের প্রধান চারি আখড়া বা স্থান; ছাপড়ার মধ্যে মীর্জাপুরে, মুজফরপুরে, মন্নুরাচৌকীতে, দংসী ও তেলপায়।

দরিয়া সাহেব কখনো কখনো আরা জেলার হরদীতে, গাজীপুর বাইসীতে, বস্তী জেলার কবীরের মৃত্যু-স্থান মগহরে ও কাশীতে যাইতেন। কবীরের স্থানগুলি তাঁর খুব প্রিয় ছিল। তবু সেখানে তীর্থকরার উপদেশ তিনি দেন নাই।

ইঁহাদের সম্প্রদায়ে সাধু মহান্তরা হিন্দু-মুসলমানের সাধনার যোগ ও মৈত্রীর কথা এখনো বলেন।

ইঁহাদের প্রধান গ্রন্থ জ্ঞানদীপক। মধ্যযুগের সকল ভক্তের মত দরিয়া সাহেবও সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন। ইঁহার রচিত বসন্ত, হোলী, মল্লার, বেহাগড়া প্রভৃতি রাগের সুন্দর গান আছে। ইঁহার প্রার্থনা ও বন্দনা খুব সুন্দর।

দরিয়া সাহেব বিহারীর কথা বলিবার সঙ্গে মাররাড়ের দরিয়ার কথা বলা উচিত। ইনি প্রায় বিহারী দরিয়া সাহেবেরই

দরিয়া সাহেব মাররাড়ী

সমসাময়িক। ইঁহারও জন্ম মুসলমান মাতার উদরে,—ইনি নিজেই বলেন ধুনকর বংশে। ১৬৭৬ খ্রীঃ ইঁহার জন্ম, ও ১৭৫৮ খ্রীঃ মৃত্যু। পিতার মৃত্যু হওয়ায় মাতামহ কমীরের গৃহে ইনি পালিত। মেড়তার অন্তর্গত রৈন গ্রামে কমীরের বাসস্থান। ইনি বিকানীর খিয়ান্‌সর গ্রামের ভক্ত সাধক প্রেমদাসজীর শিষ্য।

ইঁহার প্রধান শিষ্য ছিলেন সুখরামদাস, তিনি জাতিতে শিকল-নির্ম্মাতা লৌহকার। মাররাড়রাজ মহারাজ বখত সিংহ নাকি সুখরামের কাছে উপদেশ পাইয়া রোগমুক্ত হন।

অনেকে মনে করেন, ইনি দাদূরই অবতার। তবে দাদূর উপদেশের প্রভাব ইঁহার লেখায় খুব বেশী। ইঁহার বাণীও দাদূর মত অঙ্গে অঙ্গে ভাগ করা। তবে ৩৭টি অঙ্গের স্থানে অঙ্গ সংখ্যা ১৫টি এবং অনেক অঙ্গের নামও এক।

রাজপুতানায় এই মতে বহু বহু ভক্ত আছেন এবং অনেক স্থানে ইঁহাদের মঠ ও সাধনা-স্থান আছে।

ইঁহারা রামনাম, পরব্রহ্ম প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করেন। ইঁহাদের ব্রহ্ম-পরিচয় অঙ্গে যোগের গভীর কথা আছে। গৃহী,

উদাসী—দুই ভাবের সাধুকেই ইঁহারা মানেন। ইঁহার গান হিন্দু-মুসলমান সাধকদের মধ্যেও বেশ সমাদৃত।

এক কসাই সদনা পূর্ব্বকালে সাধনা করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন।

সদনা

সিন্ধুদেশে এক সদনার জন্ম। অনেকে মনে করেন উভয়েই এক।

কাশীতে সপ্তদশ শতাব্দীতে এক সদনা বা সাধনভক্ত জন্মগ্রহণ করেন। কসাই বলিয়া তাঁরও নাম হয় সদনা। তিনি বৈষ্ণব ভাবাপন্ন ছিলেন। রামানন্দী মতের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল। ইঁহার সম্প্রদায়ে বেদশাস্ত্র, তীর্থব্রত ও মূর্ত্তিপূজার প্রতি কোন আস্থা নাই। জাতির জোরে উচ্চতা হয়, এ কথা ইঁহারা মানেন না, ইঁহাদের মধ্যে কবীর ও দাদূপন্থীভাবের প্রভাব আছে। ইন্দ্রিয়জয় করা ও শান্ত দান্ত হওয়াই ইঁহাদের মতে সাধনার প্রধান কথা।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে লালদাসের জন্ম। রাজপুতানার

লালদাসী

লুণ্ঠনপ্রিয় মেও জাতির মধ্যে তাঁর জন্ম। আলওয়ারে তাঁর জন্মস্থানে ইঁহাদের প্রধান মঠ। মেও প্রভৃতি জাতিতে তাঁর ভক্ত-সংখ্যা বেশী। ইঁহারা জপ ও কীর্ত্তন-পরায়ণ। ইঁহাদের বাণীতে দাদূর প্রভাব বিশেষ লক্ষিত হয়। কবীরের উপদেশের সঙ্গেও ইঁহাদের বাণী অনেকটা মেলে।

ছাপড়া জেলায় মাঝী গ্রামে, শ্রীবাস্তব কায়স্থবংশে ১৬৫৬

ধরণীদাস

খ্রীঃ ভক্ত ধরণীদাসের জন্ম। ধরণীদাসের পিতার চাষবাস ছিল। ধরণীদাস নিজে জমিদারের দেওয়ানী করিতেন।

সেবানন্দ সাধুর সঙ্গে পরিচয় হইয়া তাঁর অধ্যাত্ম-দৃষ্টি খুলিয়া যায়। তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া সেই গ্রামেই কুটীরে দীন-ভাবে বাস করিতে থাকেন।

তাঁহার দুই গ্রন্থ 'সত্যপ্রকাশ' ও 'প্রেমপ্রকাশ' অনেকটা কবীরের ভাবে পূর্ণ। তাঁর আরতি ও প্রার্থনা-বাণী সাধুরা সমাদর করেন।

তিনি বলেন—'কর্ম্মের মূল্য কেবল আদর্শকে প্রত্যক্ষ জগতে সিদ্ধ করিবার জন্য। 'জীবজহান' অর্থাৎ মানব ও জগৎ সকল ব্যাপিয়া এক খোদাই বিরাজিত। হৃদয়ের প্রভু দূরে নাই, বেদনা বিনা তাঁহার দর্শন মিলে না।' তীর্থব্রতাদি বাহ্য বস্তুর ব্যর্থতা তিনি বারবার দেখাইয়াছেন। তিনি বলেন—'প্রেমের ব্যথা, সত্য ব্যাকুলতা জীবনে চাই।'

ইঁহার শিষ্য সদানন্দ পরে সম্প্রদায়ের নেতা হন।

ঘাসীদাসী, লালদাসী, জীবনদাসী প্রভৃতিদের মতবাদ ভারতে নানা নিম্নশ্রেণীর মধ্যে মানবজীবনের মহত্ত্ববোধ জাগ্রত করিতে লাগিল। কাজেই ভারতের নানা স্থানে নিম্নশ্রেণীর সাধকদের উদ্ভব হইতে লাগিল।

সুথরাসাহী

এখানে পঞ্জাবের সুথরাসাহী ভক্তের নাম করা যাইতে পারে। জন্মমাত্র ইঁহাকে ইঁহার পিতা নাকি মলিন বা কুথরা বলিয়া ত্যাগ করেন। গুরু হরগোবিন্দ তাঁহাকে সুথরা বা পবিত্র বলেন। কিন্তু এইরূপ ব্যাখ্যা কাল্পনিক, আসলে তিনি সুতার বা ছুতার বংশে উৎপন্ন, লাহোরে কাশ্মীর দরজার বাহিরে ইঁহাদের মঠ। পাঠানকোটের কাছে বরহানপুরে ইঁহার আদি স্থান।

হরগোবিন্দ ইঁহাকে রক্ষা না করিলে তিনি মুসলমান অনাথালয়ে রাজ-ব্যবস্থায় নীত হইতেন। তিনি গুরুকে যথেষ্ট সহায়তা করেন। তিনি বেশ বীর ছিলেন। আওরংজেব ইঁহাকে বড় দুঃখ দেন। পরে ইনি যখন হিন্দু ও মুসলমান দুই সাধনাই নিজের মধ্য হইতে দেখাইলেন, তখন বিরুদ্ধবাদীরা নিবৃত্ত হইলেন।

ইঁহার প্রধান শিষ্য ঝংগড় শাহ। ইঁহাদের লাহোরের মঠে ভাদ্র অমাবস্যায় মেলা হয়। দিল্লীতে পুরাণীমণ্ডীতে ইঁহাদের এক মঠ আছে। অন্যস্থানের সুথরাসাহীরা তাঁহাদের অপাংক্তেয় মনে করেন। তাঁহারা নাকি মুসলমান-সংস্পর্শে দূষিত।

পূরণ ভগত

পূরণ ভগতের স্থান পাঞ্জাবের শিয়ালকোটে। এখানেও বহু ভক্ত লোক সাধনার্থ যান।

গরীবদাস পাঞ্জাব

ভারতের বহু স্থানে গরীবদাস নামে সব সাধক হইয়াছেন। দাদূর পুত্র গরীবদাসের কথা বলা হইয়াছে। ছুরানীর গরীবদাসের কথা পরে বলা হইবে। পাঞ্জাবে এক গরীবদাস ছিলেন। ইনি একেশ্বরবাদী ও হিন্দু-মুসলমান সাধনায় মিলনের পক্ষপাতী ছিলেন।

ছজ্জু ভগত

ছজ্জু ভগতের স্থান লাহোরে। ইঁহার মধ্যে কবীরপন্থী ও শিখপ্রভাব লক্ষিত হয়। ইনি খানিক পরিমাণে হিন্দু-মুসলমান ভাবের সমন্বয় করিতে চাহিলেও প্রচলিত হিন্দুসমাজের আচার-ব্যবহারের দিকে ইঁহার কতকটা পক্ষপাত ছিল।

ধর্ম্মের পিপাসায় ব্যাকুল হইয়া বাবালাল লাহোরে আসেন ও তথায় চৈতন্য স্বামী বা বাবা চেতনের সঙ্গ লাভ করেন। ইঁহার জন্মস্থান মালবায়।

বাবালাল

১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি খত্রী কুলে তাঁর জন্ম হয়। তিনি রাম নাম ব্যবহার করিলেও তাহা দ্বারা কোনো বিশেষ অবতার বা সাম্প্রদায়িক দেবতা বুঝিতেন না। রাম বা হরি বা ভগবানের দ্বারা তিনি সকল সম্প্রদায়ের উপাস্য এক পরম দেবতাকেই বুঝিয়াছেন। তিনি বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদী ছিলেন। কবীর ও দাদূর মত তিনি বিশ্বাস করিতেন। তিনি বলেন—'শম, দম, চিত্তশুদ্ধি, দয়া, পরসেবা, সহজ ভাব, সত্যদৃষ্টি "অহম্-ক্ষয়" প্রভৃতি দ্বারা ভক্তি ও প্রেমের পথে ভগবান্‌কে লাভ করা যায়। তাঁর প্রেমে জীবন ভরিয়া উঠে। ভগবানের সঙ্গে প্রেমযোগের আনন্দ বাক্যে বলিয়া বুঝান যায় না।' একজন তাঁহাকে প্রশ্ন করেন সেই যোগানন্দ কি প্রকার? তাহাতে তিনি বলেন, যদি তাহা বাক্যে বুঝাইবার মত হইত তবে তাহার জন্য সাধনা করার কোনোই প্রয়োজন থাকিত না। বিষয়-বিরতি অর্থে তিনি অশন বসন ত্যাগ করিয়া দেহ-দুঃখ বুঝিতেন না। তিনি বলিতেন, বিস্মৃতি ও মোহ-অচেতনতা-ত্যাগই বিরতি। ভগবান্ হইলেন আনন্দসিন্ধু, প্রতি জীব তাঁর এক এক বিন্দু। এই যে পার্থক্য ইহার মূলে জীবের 'আধারঘটাত্মক' অহম্। এই অহম্‌কে লোপ করিলেই যোগ হইবার সম্ভাবনা। মৃত্যুতে এই বিচ্ছেদ-মূল ঘটের অবসান হয় না, সাধনায় তাহা ক্ষয় করা চাই। সূফী ভাবও ইঁহার প্রচুর ছিল। দারাশিকোহের সঙ্গে ইঁহার গভীর যোগ ছিল। ১৬৪৯ খ্রীষ্টাব্দে দারার সঙ্গে

তাঁহার যে সব গভীর ধর্ম্মালোচনা হইয়াছিল তাহার সুন্দর বিবরণ নাদির উন নিকাত (Nadir un Nikat) নামে পারসী গ্রন্থে লিখিত আছে।

দারাশিকোহ

দারাশিকোহের কথা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। এখানে তাঁহার বিষয় আরও কিছু বলা দরকার। তখনকার ধর্ম্মসাধকদের অনেকের সঙ্গেই তাঁর আলাপ ছিল। আর তাঁর মতামতের প্রভাব তখনকার অনেক সাধকদের মধ্যে পড়িয়াছে। ভারতীয় ভক্তরা তাঁহাকে একজন সাধক বলিয়াই জানেন। সর্ব্ব ধর্ম্মের ভ্রাতৃত্ব, সর্ব্ব মানবের মৈত্রী তাঁর জীবনের স্বপ্ন ছিল। অকালে তাঁহার মরণ হওয়ায় তাঁহার মনের সব সঙ্কল্প অপূর্ণই রহিয়া গেল। ভারতে ধর্ম্মের যে মৈত্রীর কথা তিনি ভাবিতেছিলেন তাহা ভাঙ্গিয়া গেল। সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে সাধনায় সাধনায় বিদ্বেষ জ্বলিয়া উঠিল। ভারতের সাধনা খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল। আজও সেই দুর্গতির অবসান হইল না।

দারা যে কেবল হিন্দু-মুসলমান সমস্যা লইয়াই ছিলেন তাহা নহে। শিক্ষা, দীক্ষা, সাধনা এবং ধর্ম্মে পুরুষ ও নারীকে কি প্রকারে পরস্পরের বাধাস্বরূপ না করিয়া পরস্পরের সহায়স্বরূপ করা যায়, ইহাও তাঁহার মনে সর্ব্বদা জাগিতেছিল। তত্ত্বজ্ঞ সাধক, সূফী ও সন্ন্যাসী, হিন্দী ও আরবী, সংস্কৃত ও পারস্য ভাষার পণ্ডিত লইয়া, গ্রীকদর্শন ও বেদান্তদর্শনের মর্ম্মজ্ঞদের লইয়া, তিনি দিল্লীর প্রাসাদে যে এক অপরূপ উৎসব-সভা জমাইয়া তুলিতেন, নারীদেরও তাহাতে যোগ দিবার ব্যবস্থা ছিল। এই সভায় 'রসগঙ্গাধর'-রচয়িতা

জগন্নাথ মিশ্র তাঁর সংস্কৃত কাব্য শুনাইতেন। এই সভায়ই একজন শ্রোত্রী ছিলেন দিল্লী মুঘল প্রাসাদের এক বাদশাজাদী, তিনি সংস্কৃতে বিলক্ষণ রসজ্ঞা ও জগন্নাথের প্রতি অনুরাগিণী ছিলেন। তাঁর আন্তরিক প্রীতির সংবাদ পাইয়াই কবি জগন্নাথ মিশ্র দূর হইতে তাঁহার প্রতি প্রীতিযুক্ত হন।

জগন্নাথের কাব্যরসে তুষ্ট হইয়া একবার দারা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—"তোমার কি প্রার্থনা বল, তুমি যাহা চাও তাহাই পূর্ণ করিব।" কবি বলিলেন, "ঐ কন্যাটিকে চাই।" দারা কহিলেন, "কন্যা কি তোমার প্রতি অনুরাগিণী?" কবি কহিলেন, "খোঁজ করিয়া জানুন।" দারা সন্ধান করিয়া কহিলেন—"কবি, তোমার কথা সত্য, তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিব বটে, কিন্তু তোমাকে আমি হারাইব। দিল্লী তোমায় ছাড়িতে হইবে।" দারা রাত্রিতে উভয়কে অশ্বযোগে দূরস্থানে পোঁছাইয়া দেওয়াইলেন। কবি কাশীতে গেলেন, গিয়া দেখেন কোন মন্দিরে আর তাঁর প্রবেশাধিকার নাই। আর কিছু না জানিলেও কাশীর লোকেরা জানিয়াছিল জগন্নাথ বিধর্ম্মী কন্যাকে সঙ্গে আনিয়াছেন। তখন তীর্থের মধ্যে তাঁর কাছে একমাত্র মুক্ত রহিল গঙ্গা। জগন্নাথের গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণী, গঙ্গাস্তব তাই এত মর্ম্মস্পর্শী। পরে তিনি কাশী ছাড়িয়া বিন্ধ্যপর্ব্বততলে গঙ্গাতীরে দুর্গাখোহে গিয়া বাস করেন। দারার ইতিমধ্যে মৃত্যু ঘটে। জগন্নাথ ও তাঁর স্ত্রীও দীর্ঘকাল দারার বিরহ সহ্য করেন নাই। দুর্গাখোহতেই তাঁহাদের মৃত্যু ঘটে। জগন্নাথের "ভামিনী-বিলাস" এই যবন-কন্যার সৌন্দর্য্যরসেরই প্রকাশ।

ইহাতো গেল একটি মানবপ্রেমের ঘটনা। কিন্তু পারমার্থিক ও জ্ঞানের সব ক্ষেত্রে নারীদের সাহচর্য্য দারার স্বপ্নের মধ্যে ছিল। এই সব "ভাবের পাগলামী" দারার অনুবর্ত্তী ও সহচরদের মধ্যেও অনেকটা সংক্রামিত হইয়াছিল।

দারার এই সব ভাবের স্পর্শে অনেকে উদার সার্ব্বভৌম সাধনার সাধকও হইয়া উঠিলেন। তার মধ্যে একজনের নাম এখন করা যাইতেছে, তিনি চরণদাস।

চরণদাস

দারার প্রভাব দারার সহচরদের সহায়তায় শিবনারায়ণ প্রভৃতি সম্প্রদায়েও গিয়া পৌঁছিল। তাঁহার সঙ্গে চরণদাসের সাক্ষাৎ ঘটে নাই। দারার ভাবের প্রতি অনুরাগী সুখানন্দের সংস্পর্শে আসিয়া চরণদাসের মত ও জীবন পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। এই সুখানন্দ ছিলেন কবীরের প্রতি ভক্তিমান্ ও দারাশিকোহের অনুরাগী।

রাজপুতনার আলয়ার রাজ্যে ডহরা বা ডেহরা গ্রামে রেরাড়ীবাসী এক বণিক্‌কুলে ১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দের ভাদ্রমাসে চরণদাসের জন্ম। চরণদাসের পূর্ব্বের নাম ছিল রণজিৎ।

ডেহরা গ্রামে যখন রণজিৎ বালক মাত্র তখন তাঁর পিতা জঙ্গলে নিরুদ্দেশ হইয়া যান, কি বাঘের হাতে মারা যান। তাঁহার মাতামহ এই খবর শুনিয়া রণজিৎকে তাঁর মাতা সহ দিল্লীতে লইয়া আসিলেন এবং রাজকার্য্যে প্রবেশ করাইবার জন্য শিক্ষা দিতে লাগিলেন। যখন রণজিতের ১৯ বৎসর বয়স, সুখানন্দের সংসর্গে তখন তাঁর মতিগতি বদলিয়া গেল, ৩০ বৎসর বয়সে চরণদাস ধর্ম্মোপদেশ দিতে লাগিলেন।

তাঁর ভক্তেরা বলেন শুকদেব গোস্বামী নাকি তাঁহাকে দীক্ষা দিয়া যান।

দয়াবাঈ ও সহজোবাঈ চরণদাসের জ্ঞাতি আত্মীয়া। পূর্ব্ব হইতেই চরণদাসের সঙ্গে ইঁহাদের ঘনিষ্ঠতা ছিল, চরণদাস ধর্ম্মজীবন লাভ করিলে উহারা তাঁহার কাছে সাধনার উপদেশ চাহিলেন। নারীদের সাধনাও অধ্যাত্মরাজ্যে অমূল্য, এই কথা মনে করিয়া তিনি ইঁহাদের উপদেশ দিলেন।

চরণদাসের মৃত্যুর পর মুক্তানন্দই সম্প্রদায়ের নেতা হইলেন। চরণদাসের শিষ্য রামরূপজী 'গুরুভক্তি প্রকাশ' গ্রন্থে চরণদাসের সম্বন্ধে অনেক কাহিনী লিখিয়াছেন। তাঁহার শিষ্য রামস্নেহী খুব ভক্ত ও সমর্থ সাধক ছিলেন।

চরণদাসের সম্প্রদায় নৈতিক পবিত্রতার জন্য বিখ্যাত।

দশ নিষেধ

বল্লভাচার্য্যমতের নানা কদাচার সমাজে প্রবেশ করিয়াছিল। তখন চরণদাসের উপদেশে প্রভূত উপকার হইল। চরণদাসের মতে এই দশটি কার্য্য নিষিদ্ধ—(১) মিথ্যাবচন, (২) কুবচন অর্থাৎ অশ্লীলবচন, (৩) কটুবচন অর্থাৎ গালি, (৪) বৃথাবচন অর্থাৎ তর্ক, (৫) চৌর্য্য, (৬) ব্যভিচার, (৭) হিংসা, (৮) অকল্যাণ-চিন্তা, (৯) বিদ্বেষ, (১০) অহঙ্কার।

চরণদাসের মতে এই কয়টী কার্য্য পালনীয়। গার্হস্থ্য ধর্ম্ম ও

করণীয়

সামাজিক ধর্ম্ম, সৎসঙ্গ, সাধুসঙ্গ, গুরুতে ভক্তি, বিশ্বমূল শ্রীহরিতে ভক্তি। ইঁহাদের মধ্যে গৃহী ও বৈরাগী দুই রকমের সাধুই আছেন, তাঁদের বস্ত্র হল্‌দে। চরণদাসের মতে বেশভূষা ভব্য, ভদ্র ও পবিত্র হইবে।

বল্লভমতের নানাবিধ বিকার ও ব্যভিচার দূর করিবার জন্য চরণদাসকে অনেক শ্রম করিতে হয়। ইনি সংস্কৃত গীতা ভাগবত প্রভৃতি অনুবাদ করান। নিজে সন্দেহসাগর ও ধর্ম্ম-জাহাজ-তুলনীয় (দারার "শাফিনাৎ-ই-আউলিয়া") এই দুই গ্রন্থ লেখেন। ইঁহার শিষ্যা সহজোবাঈ সহজপ্রকাশ ও ষোলতত্ত্ব-নির্ণয় গ্রন্থ লেখেন। চরণদাসের শিষ্যসেবকদের রচিত ভাষা-গ্রন্থ অনেক আছে। দয়াবাঈ 'দয়াবোধ' ও 'বিনয়মালিকা' গ্রন্থ রচনা করেন।

চরণদাস বলেন, "এই বিশ্ব ব্রহ্মময়। তুলসী, শালগ্রাম প্রভৃতি প্রতীক ব্যর্থ। চরিত্র, নীতি ও সদাচার সাধনার প্রথম ও প্রধান কথা, প্রেমভক্তি সাধনার প্রাণ। কিন্তু প্রেম ও ভক্তি যদি কর্ম্মে ও সেবায় প্রকাশিত না হয় তবে সে প্রেমভক্তি নিস্ফল। হৃদয়ের ভাব সত্য হয় আচরণে।" কোনো কোনো অংশে মাধ্বমতের এক আধটুকু ছায়া থাকিলেও প্রধানতঃ তাঁর উপদেশে কবীরের প্রভাবই বেশী।

দিল্লীতে চরণদাসের সমাধি ও চরণদাসীদের প্রধান মঠ। সেখানে শ্রীপঞ্চমীতে মেলা হয়। দিল্লীতে ইঁহাদের আরও মঠ আছে, চরণদাসের জন্মস্থান ডহরায় মঠ আছে। কিন্তু ইঁহার পিতৃস্থান বাহাদুরপুরের মঠই বড়। "দুয়াব" প্রদেশেই ইঁহাদের মঠের সংখ্যা বেশী। ইঁহাদের নিত্য ব্যবহার্য্য ধর্ম্ম-উপদেশ সংগ্রহে একটি অধ্যায় উপনিষদের, আর একটি অধ্যায় ভাগবতের বাণীতে পূর্ণ। তাহার ভাষা প্রাঞ্জল ও গম্ভীর।

ইঁহার সময় মুসলমান রাজ্য নষ্ট হইতে বসিয়াছে। নাদির-শাহ ও আব্দালীর আক্রমণ এবং পানিপথের যুদ্ধ ইঁহার জীবন-

কালেই ঘটে। মুহম্মদ শাহ, অহমদ শাহ, দ্বিতীয় আলমগীর, শাহ আলমের রাজত্ব দেখিয়া ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মারা যান।

সহজোবাঈ

যদি চরণদাস তাঁহাকে ধর্ম্মসাধনায় গ্রহণ না করিতেন, তবে চরণদাসের কুলে জন্মিয়াও সহজোবাঈ চরণদাসের মহিমা বুঝিতে পারিতেন না। ইঁহার 'সহজপ্রকাশ' গ্রন্থ উত্তর ভারতের ভক্তেরা বেশ সমাদর করেন। পাঞ্জাব, রাজপুতানা, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ইঁহার অনুরাগী অনেক সাধু আছেন।

ইনি লিখিয়াছেন, "গুরুর কৃপায় জীবনের সার্থকতা কি বুঝিলাম।" কুটুম্বগণের হাতে অশেষবিধ দুঃখ সহিয়াছেন, তবু সেজন্য তাঁর কোন ক্ষোভ ছিল না। তাঁর লেখা দেখিয়া মনে হয়, তখন ভক্ত সাধু ও লোভী আত্মীয়-স্বজনের ব্যবহার দেখিয়া ইঁহার মন বড় ব্যথিত হইয়া গিয়াছিল।

দয়াবাঈ

দয়াবাঈ চরণদাসের আর এক শিষ্যা। 'দয়াবোধ' ও 'বিনয়-মালিকা' ইঁহার রচনা। দয়াবোধে দাদূর বাণী সংগ্রহের প্রণালীতে গুরুমহিমা, নাম-স্মরণ,. সাধনার বীর্য্য, প্রেম, বৈরাগ্য, সাধুমহিমা ও শ্বাস জপের অঙ্গ আছে। বিনয়মালিকা দয়ার রচিত মর্ম্মস্পর্শী প্রার্থনা-মালায় পূর্ণ।

দক্ষিণ ভারতের ভক্ত নারী আণ্ডাল ও রাজপুতনার মীরা বাঈর নাম পূর্ব্বে করিয়াছি। ভক্ত নারী আরও অনেকে আছেন। তাহাদের নাম করা হয় নাই। এখানে দুই এক জনের নাম করা যাইতেছে।

কবীরের সমসাময়িক গোপকন্যা ক্ষেমা অতি গভীর সাধিকা ছিলেন। এই ক্ষেমা বা ক্ষেমশ্রীর সঙ্গে আলাপে স্বয়ং কবীরও অনেক উপকার পাইয়াছেন। ইঁহার একটি বাণী, প্রাণের স্বরূপ বর্ণনা—রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'Creative unity' গ্রন্থে অনুবাদ করিয়াছেন, তাহা এতই সুন্দর।

ক্ষেমা

কবীরের কয়েকজন নারীশিষ্যা ছিলেন, তার মধ্যে গঙ্গাবাঈ একজন। কবীরের কন্যা কমালীও বেশ গভীর সাধিকা ছিলেন। রামানন্দেরও নারীশিষ্যা ছিলেন। তাঁহাদের কিছু কিছু বচন এখনো সাধুদের মুখে মুখে চলিত আছে। এখানে সে সব কথা বলার অবসর নাই। তবু দাদূর কন্যাদের একটু পরিচয় না দিলে অন্যায় হইবে।

দাদূর দুই কন্যা। ১৬৩৫-১৬৪০ খ্রীঃ মধ্যে ইঁহাদের জন্ম। দাদূ ইঁহাদিগকে বড় করিয়া ধর্ম্ম উপদেশ ও শিক্ষা দিয়াছিলেন। আমেরে ইঁহাদিগকে বয়স্থা অথচ অবিবাহিতা দেখিয়া জয়পুরের রাজা ভগবংতদাস (মানসিংহের পিতা) একটু বিরুদ্ধভাব প্রকাশ করায় দাদূ আমের ত্যাগ করিয়া নরানায় আসিয়া বাস করেন। দাদূর ইচ্ছা ছিল ইঁহারা বিবাহিত হইয়া গৃহস্থ হন। ইঁহারা ব্রহ্মচারিণী থাকিয়া সাধনা করিতে চাহিলেন। ইঁহাদের বাণী এখন দুর্ল্লভ। তবু সাধুদের কাছে যাহা কিছু মিলে তাহা অতিশয় চমৎকার।

নানীবাঈ ও মাতাবাঈ

ভক্তমালে ব্রজ গোপিকা ছাড়া আরও কুড়ি পঁচিশটি ভক্ত নারীর কথা আছে। ভক্তমাল সর্ব্বজনবিদিত গ্রন্থ। তাঁহাদের নাম এখানে করিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই।

কবীরের ও তাঁর অনুরাগী ভক্তদের কথা বলিতে গিয়া মলুকদাসের নাম এতক্ষণ করা হয় নাই। তাঁর উপর কবীর অপেক্ষা কবীর-গুরু রামানন্দের প্রভাবই বেশী, তবে তিনি বা তাঁহার শিষ্যরা বিবাহ করিয়া গৃহস্থ হইতেন; এই হিসাবে তাঁহারা কবীরের উপদেশই প্রধানতঃ অনুসরণ করিয়াছেন।

মলুকদাস

এলাহাবাদ জেলায় কড়া গ্রামে মলুকদাসের জন্ম। পিতার নাম সুন্দরদাস। তিনি ক্ষত্রীবংশীয় ছিলেন। ১৫৭৪-১৬০০ খ্রীঃ মধ্যে তাঁর জন্ম হয়।

বাল্যকাল হইতে মলুকদাস দয়ালু ও পরদুঃখকাতর। রাস্তার কাঁটাটি দেখিলে তাঁহা সরাইয়া রাখিতেন, যেন লোকে দুঃখ না পায়। এই অতি-দয়ালুতার জন্য ব্যবসায় করিতে গিয়া তিনি নিষ্ফল হন।

পরে ইনি দ্রাবিড় দেশীয় ভক্ত বিঠ্ঠলদাসের শিষ্য হন। মলুক গৃহস্থ ছিলেন। তাঁর একটি কন্যা হইয়াছিল। কিন্তু স্ত্রী ও কন্যা উভয়ে অল্প বয়সেই মারা যান।

লালদাস প্রভৃতি ইঁহার ১২ জন শিষ্য ছিলেন। মৃত্যুর পর ইঁহার ভাইপো রামসনেহী মণ্ডলের প্রধান হইলেন। ১৬৮২ খ্রীঃ ইনি দেহত্যাগ করেন।

বিহার হইতে মূলতান এমন কি কাবুল পর্য্যন্ত উত্তর ভারতে নানা স্থানে ইঁহাদের মঠ ও ভক্ত আছেন। জয়পুর এবং গুজরাটেও ইঁহাদের ভক্ত দেখিয়াছি। নেপালেও ইঁহাদের ভক্ত আছেন। ভগবানের উপর মলুকদাসের অসাধারণ নির্ভর।

মূর্ত্তি ও প্রতিমাপূজা, বাহ্য আচার, তীর্থ ব্রতাদির বিরুদ্ধে

ইনি স্বয়ং প্রচার করিলেও ইঁহার সম্প্রদায়ে কতক পরিমা কা দোষ প্রবেশ করিয়াছে।

ইঁহার লেখা ভক্তবৎসল, 'রত্নখান' ও 'দশরত্ন গ্রন্থ' ভক্তি ও প্রেমের বাণীতে ভরপূর। ইহা ছাড়া তাঁহার অনেক সুন্দর উপদেশ ভক্তদের মুখে মুখেও চলিত আছে।

কবীরের মত ইনিও দেহ-কর্ষণের নিষ্ফলতার উপদেশ দিয়া বাহ্য আচার ও সাম্প্রদায়িক আড়ম্বর ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন।

গরীবদাস

১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে গরীবদাসের জন্ম। তাঁহার জন্মস্থান পাঞ্জাবের অন্তর্গত রোহতক্ জেলায় ছুরাণী গ্রামে।

তিনি স্বপ্নে কবীরকে দেখিতে পান এবং স্বপ্নে তাঁর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। কবীরের ভাবেই তিনি ভরপূর। ইনি জাঠকুলে জন্মগ্রহণ করেন। চাষবাস ছিল ইঁহার বৃত্তি। ইঁহার বাণী ও কবীরের বাণী একত্র করিয়া এই সম্প্রদায়ের বাণী সংগ্রহ।

গরীবদাস গৃহস্থ ছিলেন এবং ইঁহার বংশীয় গৃহস্থ গুরুরাই এই সম্প্রদায়ে মহান্ত হন।

এই ছুরাণী গ্রামে ফাল্গুন মাসের শুক্লা দশমীতে প্রতি বৎসর ভক্তদের এক প্রকাণ্ড মেলা বসে।

ইনি নারীদেরও ধর্ম্ম সাধনা দিতেন। ১৭৭৮ সালে ইনি দেহত্যাগ করেন।

ইঁহার শিষ্যদের মধ্যে সলোতজী বিশেষ সমর্থ সাধক ছিলেন।

ইঁহার বাণীর প্রথম অংশ দাদূর বাণীর মত অঙ্গভাগ করা। তাহাতে ১৫টি অঙ্গ আছে। অঙ্গগুলির নামও দাদূরই মত।

দু-মুসলমান উভয় ভাবের পদ আছে। ইনি আল্লা, রাম, হরি—সব রকম নাম ব্যবহার করিয়াছেন। বাহ্য ক্রিয়া-আচার ছাড়িয়া ইঁহার মতে অন্তরে প্রবেশ করিয়া প্রেম-ভক্তিকে আশ্রয় করিলে তবেই সাধনা সত্য হয়। ইঁহার প্রার্থনা-বাণীও অতিশয় মর্ম্মস্পর্শী।

শিবনারায়ণ

শিবনারায়ণ সম্প্রদায়ে হিন্দু-মুসলমান উভয় ভাবের সম্মিলন ঘটিয়াছে। বালিয়া জিলায় চন্দ্রবার গ্রামে রাজপুত বংশে তাঁর জন্ম। ১৭১০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি তাঁর জন্ম। ইনি পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে খুব তীব্রভাবে বলিয়াছেন। ভারতের বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদীদের মধ্যে ইনি একজন প্রধান। ইঁহাদের মতে ঈশ্বর সর্ব্বগুণাতীত নিরাকার। মদ্য, মাংস, মৎস্য ইঁহারা বর্জ্জন করেন। একান্ত ভক্তি, নির্ম্মলচিত্ত ও চরিত্র, সম, দম ও মৈত্রী সাধনার একান্ত প্রয়োজন—এই কথাই ইঁহারা বলেন। ইঁহারা স্নানকালে মন্ত্র জপ করেন। সকল ধর্ম্মের ও সকল জাতির লোকই এই সম্প্রদায়ে আসিতে পারে। মাঘী শুক্লা পঞ্চমীতে ইঁহাদের বড় মেলা বসে।

কথিত আছে ইনি দারা শিকোহের ভাবে অনুপ্রাণিত ছিলেন। দারার কোন কোন ভক্তের সঙ্গে ইঁহার পরিচয় ঘটে, হিন্দু-মুসলমান উভয় ভাবই ইঁহাদের সাধনাতে আছে। বাদশাহ মুহম্মদশাহ নাকি এই ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন, তাঁর রাজত্ব কাল ১৭১৯—১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দ। সমসাময়িক কবি রলী আল্লাহ, কবি আব্রূ ও কবি নাজী শিবনারায়ণের সাধনার প্রতি শ্রদ্ধা রাখিতেন। ইনি নিজে বিস্তর লিখিয়াছেন। ১৬খানি গ্রন্থ ইঁহার রচনা।

তাত্‌বা গ্রামের কাছে অনেক চামার ও দোসাদ জাতি আছে যাহারা এই সম্প্রদায়ের শিষ্য। তাহারা মৃতদেহ গোর দেয়। ইহাদের অনুবর্ত্তীদের মধ্যে মুসলমান এবং খ্রীষ্টানও আছেন। আরা জেলায় এই সম্প্রদায়ের খ্রীষ্টান শিষ্য আছেন।

বুল্লেশাহ ও সৎনামী বুল্লাসাহেব ভিন্ন ব্যক্তি। কেহ কেহ বলেন বুল্লেশাহের জন্ম ১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দে, কন্‌স্টান্‌টিনোপল নগরে। ইনি জাতিতে সৈয়দ। অল্প বয়সে ইঁহার তীব্র আধ্যাত্মিক ক্ষুধা জাগ্রত হয়। স্বদেশে তাহা না মিটায় ভারতের সাধকদের খ্যাতি শুনিয়া পদব্রজে পাঞ্জাবে আসেন। সেখানে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সাধনায় প্রবীণ সাধক ইনায়ত শাহের সঙ্গ-লাভ করেন। কয়েক জন হিন্দু সাধকদের সঙ্গও লাভ করেন। লাহোরের নিকট কসূর গ্রামে তিনি সাধনায় বসিয়া যান। মৌলবীরা সর্ব্বদা ইঁহাকে আক্রমণ করিতেন, কারণ ইঁনি অনেক সময় কোরানের তীব্র সমালোচনা করিতেন। কিন্তু মৌলবীরা ইঁহাকে আঁটিয়া উঠিতে পারিতেন না। ইঁনি বিবাহ করেন নাই। কসূরেই ইনি দেহত্যাগ করেন। সেখানে ইঁহার সমাধি আছে। বিস্তর সাধক ভক্ত যাত্রী সেখানে যান। ইনি এমন চমৎকার পাঞ্জাবী ভাষায় তাঁর বাণী রাখিয়া গিয়াছেন যে, জন্মতঃ তিনি পাঞ্জাবী নহেন এরূপ চিন্তা করাও কঠিন। তবে অল্প বয়সেই তিনি পাঞ্জাবে আসেন তাই ভাষা চমৎকার আয়ত্ত করিয়াছিলেন।

বুল্লেশাহ

বুল্লেশাহ বলেন—"হে বুল্লা, লোকেরা বলে, তুই গিয়া না হয় মস্‌জিদের মধ্যে বস্‌; মস্‌জিদের মধ্যে বসিলে কি লাভ যদি অন্তরের মধ্যে নমাজ না আসে?"

"হে বুল্লা, ধর্ম্মস্থানে থাকে সব দস্যু, ঠাকুরদ্বারায় ( দেব মন্দিরে ) থাকে সব ঠগ, মসজিদের মধ্যে বসিয়া আছে সব বদ্‌মায়েস ; প্রেমময় আছেন এ সকলের বাহিরে।"

"খোদাকে না পাইবে মস্‌জিদে, না পাইবে কাবায়, না কোরান কেতাবে, না নিয়মবদ্ধ নমাজে। এমনি সহজে যদি বা কিছু বুঝিতে পারি, গোল বাধাইয়া দেন সব পণ্ডিতেরা।"

"হে বুল্লা, মক্কা গেলেও মুক্তি নাই, যে পর্য্যন্ত হৃদয় হইতে অহমিকা দূর না হয় ; গঙ্গায় গিয়াও মুক্তি নাই, শত শত ডুবই দাও না কেন ? মুক্তি তখনই মিলিবে, যখন অহম্‌কে লুটাইয়া দিবে।"

"হে বুল্লা, অন্তরের মধ্যে আল্লাকে পাইয়া নিত্য পরমানন্দ পরম শান্তি পাইয়াছি। নিত্য মৃত্যু হইতে নিত্য জীবন পাইয়াছি, নিত্যই অগ্রসর হইয়া চলিয়াছি।"

"হে বুল্লা, প্রভুর প্রেমেই মত্ত থাকিস্‌। লক্ষ লক্ষ নিন্দা তোর হয়তো হৌক। লোকেরা যখন তোকে বলিবে 'কাফের' 'কাফের', তখন তুই বল্‌বি 'ঠিক কথা, ঠিক কথা।'

রাম সনেহী

রাম সনেহী—রাজপুতানার সাধক সন্তরাম বা রামচরণের এই সম্প্রদায়। ইঁহার জন্ম জয়পুর সুরাসেন গ্রামে, ১৭১৫ হইতে ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ধর্ম্ম উপদেশ করিতে আরম্ভ করেন। রাম সনেহী অর্থ রামস্নেহী বা রামের প্রেমিক। তাঁহারা প্রেমের দ্বারা ভগবান্‌কে সাধনা করেন, পৌত্তলিকতা মানেন না। রাজপুতানায় ইঁহাদের অনেক মঠ আছে। গুজরাতে, আমেদাবাদে, বড়োদায়, সুরাতে, বল্‌সারেও ইঁহাদের মঠ আছে।

অল্পদিন পূর্ব্বেই যোধপুরে ইঁহাদের মঠে মহন্ত দুলহাদাস খুব সাধক লোক ছিলেন।

প্রাণনাথী

কাঠিয়াওয়াড়ে প্রাণনাথের জন্ম। ভারতের নানা স্থানে ঘুরিয়া অবশেষে তিনি বুন্দেলখণ্ডে পান্না রাজ্যে বাস করেন। ১৭০০ হইতে ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তিনি জীবিত ছিলেন। প্রাণনাথীরা খুব উদার। হিন্দু-মুসলমান উভয়বিধ সাধনাই ইঁহারা সম্মান করেন এবং সকল ধর্ম্মের মৈত্রীই ইঁহাদের লক্ষ্য। প্রাণনাথ হিন্দু ও মুসলমান উভয় শাস্ত্রেই প্রবীণ ছিলেন। হিন্দু-মুসলমানের মিলন চিরজীবন আকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন। রাজা ছত্রশাল ( ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে পরিচয় ) তাঁর অনুরাগী ছিলেন। ইঁহাদের হিন্দু ও মুসলমান উভয় দলের শিষ্যই আছে। তাঁহারা নিজ নিজ ঘরে ভিন্নভাবে ও নিজ নিজ মতে থাকিলেও সাধনা স্থানে প্রেমে, ভক্তিতে, মৈত্রীতে একত্র সাধনা করেন। ঈশ্বরকে ইঁহারা ধাম বলেন। তাই এই সম্প্রদায়কে 'ধামী'ও বলে। প্রাণনাথের বাণীতে মুসলমান সাধনার শব্দের বড়ই বাহুল্য।

সুনীতি, চরিত্রের বিশুদ্ধি, পরোপকার, মানুষের সেবা, দয়া ইঁহাদের সাধনার অঙ্গ। ইঁহারা খুবই উদার। হিন্দু-মুসলমান উভয় শ্রেণীর শিষ্যরা একত্র বসিয়া পঙ্ক্তি ভোজন করেন। ইঁহাদের প্রধান গ্রন্থ 'কুলজুম' হিন্দু-মুসলমান ভাবে পূর্ণ। ইঁহারা বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদী।

তুলসী সাহেব

তুলসী সাহেব—এই তুলসী সাহেবের জন্ম ১৭৬৩ হইতে ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। ইনি ছিলেন জাতিতে ব্রাহ্মণ—পেশওয়া'র জ্যেষ্ঠ পুত্র।

রাজ্য ও সংসার ত্যাগ করিয়া হাথ্রসে আসিয়া বাস করেন তাই তাঁহার নাম তুলসী সাহেব হাথ্রসী। ইঁহার স্ত্রীর নাম ছিল লক্ষ্মীবাঈ। ইঁহার এক পুত্র হয়। রাজ্যে অভিষিক্ত হইবার সময় উপস্থিত হইলে ইনি সংসার ত্যাগ করেন। ইঁহার ছোট ভাই ছিলেন বাজীরাও। তাঁর সঙ্গে দেখা করিতে ইনি একবার বিঠুরে গিয়াছিলেন।

ইনি মুসলমান ও হিন্দু উভয় শাস্ত্রের ও সাধনার মর্ম্মজ্ঞ ছিলেন। তিনি বলিতেন, বাহ্য আচারে কর্ম্মে কিছু নাই। সব সাধনাই অন্তরে। আপনার সঙ্গে ব্রহ্মাণ্ডের সত্যযোগই হইল সাধনা। উভয় শাস্ত্রেরই মিথ্যা সংস্কারকে তিনি তীব্র আঘাত করিতেন।

একবার গঙ্গাতীরে স্নানরত এক ব্রাহ্মণ শূদ্রকে দূরে সরিয়া বসিতে বলায় তিনি বলেন—"কেমন শাস্ত্র তোমার? বিষ্ণুপদোদ্ভবা গঙ্গা যদি এত পবিত্র, বিষ্ণুপদোদ্ভব শূদ্র কেন তবে এত অপবিত্র?" তাঁর বহু ভক্ত ও অনুরাগী ছিলেন। তার মধ্যে রামকৃষ্ণ নামে এক মেষপালক বড় ভক্ত ছিলেন। সুরস্বামী তাঁহার প্রধান শিষ্য। ১৮৪৩ হইতে ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর প্রধান গ্রন্থ 'ঘট রামায়ণ' ও 'রত্নসাগর'। ইঁহার শব্দসমূহও সমাদৃত। তাহাতে অনেক সুন্দর কাহিনী আছে।

এখানে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অনন্তপন্থী ও আপাপন্থীর নাম করা উচিত। অনন্তপন্থীরা অনন্ত ভগবানের উপাসক। রায় বেরিলি ও সীতাপুরে ইঁহাদের স্থান। বৈষ্ণব ভাবেই ইঁহাদের সাধনা।

অনন্তপন্থী

প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে খেরী জেলায় স্বর্ণকার মুন্না দাস আপা-পন্থ স্থাপন করেন। ইঁহারা ভক্তিকে প্রাধান্য দেন। ইঁহারা তিলক, মালা, কৌপীন-ধারণ, জাতিভেদ প্রভৃতি মানেন না। মুন্নাদাসের গুরু ছিল না, নিজেই তিনি গুরু হন বলিয়া এই পন্থের নাম আপাপন্থী, অযোধ্যায় মাড়রায় ইঁহাদের প্রধান মঠ।

আপাপন্থী
মুন্নাপন্থী

গোবিন্দপন্থী—এই পন্থ ভক্ত গোবিন্দদাস কর্তৃক স্থাপিত। ইঁহারা বৈষ্ণবভাবে সাধনা করেন। ফৈজাবাদ জেলায় অহরৌলীতে তাঁর সমাধিস্থানে অগ্রহায়ণ মাসে বড় মেলা হয়।

গোবিন্দপন্থী

ভক্ত দেধরাজ—মধ্যযুগের সর্ব্বশেষে এই একজন সমর্থ ভক্তের নাম করা উচিত। ইনি নারনৌল জেলায় ধারসু-গ্রামবাসী পূরণ ব্রাহ্মণের পুত্র। ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম। দারিদ্র্যবশতঃ তের চৌদ্দ বৎসর বয়সে ইনি আগ্রা যাত্রা করেন। তখন মাধবজী রাও সিন্ধিয়া সেখানে রাজা। দেওয়ান ধর্ম্মদাসের বাড়ী ইনি চাকুরীতে প্রবৃত্ত হন ও হিন্দু-মুসলমান সর্ব্বশ্রেণীর সাধকদের সঙ্গে সেখানে মেলামেশা করেন। ধর্ম্মজীবন লাভ হওয়ায় ৩৩ বৎসর বয়সে ইনি স্বাধীন ও উদার মত প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। জাতিভেদের বিরুদ্ধে তিনি প্রচার করেন ও নিজে বৈশ্য কন্যাকে বিবাহ করেন। পরে দেশে গিয়া বাস করেন ও সেখানে প্রচার চালান। নারনৌলের অধিপতি ঝাঝরের নবাব নজারত আলী তাঁর শাস্ত্রবিরুদ্ধ মতের জন্য তাঁহাকে কারারুদ্ধ করেন। কারাগারে বহুদিন তিনি বহু দুঃখ

দেধরাজ

পান। ঝাঝরের রাজ্যে গোলমাল হওয়ায় অবশেষে কারাগার হইতে তাহারা সব কয়েদীকেই বাহির করিয়া দেয়। তিনি তখন খেতরী জেলায় ছুরীনা গ্রামে বাস করিয়া প্রচার আরম্ভ করেন। গরীব দাসের কথায় একবার ছুরীনা গ্রামের উল্লেখ করা গিয়াছে। ৮১ বৎসর বয়সে ছুরীনায় তাঁর মৃত্যু হয়।

এখন এই সম্প্রদায়ের প্রধান স্থান গুরগাঁও জেলার ভীরানীতে। মেধরাজের শিষ্য ছিলেন গঙ্গারাম। তাঁর পুত্র ছিলেন রামচন্দ্র। তাঁর শিষ্য সন্তরামের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়।

ঝাঝর, নারনৌল, গুরগাঁওতে এই মতের সাধক আছেন। ইঁহারা বলেন ঈশ্বর এক, অপরূপ, অপ্রতিম, নিত্য, সর্ব্বব্যাপী। ইঁহারা প্রতিমা মূর্ত্তি প্রতীক বা জাতিভেদ মানেন না। স্ত্রী-পুরুষের এই সাধনায় সমান অধিকার। ইনি তখনকার দিনেও পর্দ্দা প্রথার বিরুদ্ধে ঘোর যুদ্ধ করেন, তাই ইঁহাদের নারীরা পর্‌দা মানেন না—অন্ততঃ ধর্ম্মমন্দিরে পর্‌দা নাই। উপাসনার সময় মেয়েরা গান করেন। মেয়েদের কণ্ঠ খুব ভাল। ইঁহাদের সাধকদিগকে বাউলদের মত ভক্তিতে নৃত্য করিতে দেখিয়াছি।

হিন্দু-মুসলমান উভয় সাধনাতে ইঁহাদের শ্রদ্ধা আছে। মহাভারত, রামায়ণ হইতে ইঁহারা নীতি উপদেশ গ্রহণ করেন, তবে সে সব শাস্ত্রকে অভ্রান্ত বলিয়া মানেন না। পরমেশ্বরকে রাম, হরি প্রভৃতি নানা নামে উল্লেখ করেন। চলিত ভাষাতেই ইঁহাদের বাণী। মেয়েরা পর্‌দা মানেন না বলিয়া ইঁহাদিগকে নংগা বা ন্যাংটা ও এই পন্থকে "নাংগীপন্থ"ও বলে।

রামমোহন রায়ের অল্প পূর্ব্বে বর্ত্তমান কালের শিক্ষা না পাইয়াও ইঁহারা অভ্রান্ত শাস্ত্র, জাতিভেদ, পৌত্তলিকতা না

মানিয়া সকল ধর্ম্মের ভ্রাতৃত্ব স্বীকার করিয়া এক অপ্রতিম ঈশ্বরের উপাসনা ঘোষণা করিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ইঁহাদের মধ্যে মেয়েদের পর্দা নাই। উপাসনা-কালে মেয়েরা গান করেন ও মেয়েদের অধিকার পুরুষদের সমতুল্য। সকলেই ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া সর্ব্ব পুরুষ ও নারী ভাই ও ভগিনী এই মত ইঁহারা প্রচার করেন, এই সব কথা সকলের প্রণিধানের যোগ্য।

এই খানেই রাজা রামমোহনকে পুরোবর্ত্তী করিয়া বর্ত্তমান নবযুগের আরম্ভ হইল।

বাংলা দেশের আউল, বাউল, দরগা, সাঁই, সংযোগী, কর্ত্তাভজা প্রভৃতিদের কথা এখানে আর বলিলাম না, তার কারণ ইঁহাদের সঙ্গে আপনাদের কতকটা পরিচয় আছে এবং এখানে অবসরের অভাব। কর্ত্তাভজা বা সত্যধর্ম্মবাদীদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান দুই আছেন। মুসলমান গুরুর কাছে ব্রাহ্মণ দীক্ষা গ্রহণ করিতে পারেন। বাংলা, উড়িষ্যা প্রভৃতি স্থানে একসময় নাথ পংথ, নিরংজন পন্থ প্রভৃতি প্রবল স্বাধীন মতবাদ ছিল। ক্রমে তাহারা নিজেদের মহত্ত্ব হারাইয়া শাস্ত্রাশ্রিত হিন্দুসমাজের পার্শ্বে নানা উপায়ে কোন মতে একটু স্থান ভিক্ষা করিতেছে। সে সব কথা বলিবার অবসর এখানে নাই।

বহু বহু ভক্ত ও তাঁদের সাধক-মণ্ডলের নাম করিতে বাধ্য হইয়াছি। তাহার এক একটির বিষয় বলিতে গেলেই এক বক্তৃতায় কুলায় না। তাই এখানে অনেক স্থলে নামের পর নামে এই সব কথা কেবল তালিকার মত হইয়া উঠিয়াছে। অথচ অনেক স্থলে তাঁহাদের আদর্শ ও সাধনা একই রকমের। তবু বারবার সে সব প্রয়াসের উল্লেখ না করিয়া উপায় নাই। নানা সাধনায়

মৈত্রী-দ্বারা সকল ধর্ম্মের মধ্যে একটা ভ্রাতৃত্ব ও যোগ স্থাপন করিবার ইচ্ছা সবারই ছিল। বারবার সাধকের পর সাধক এই চেষ্টা করিয়াছেন, বারবার আংশিক ভাবে সফল বা নিস্ফল হইয়াছেন, তবু চেষ্টার বিরাম নাই। এই প্রয়াস বুঝাইবার জন্যই এত বার এত নামের উল্লেখ করিতে হয়। ইহার দ্বারা সকল ধর্ম্মের সঙ্গে ভ্রাতৃত্বের জন্য, সর্ব্ব সাধন ও মানবের সঙ্গে যোগের জন্য তাঁহাদের অন্তরের ব্যাকুলতা বুঝা যায়। মনে হয় যেন এই মৈত্রীই ভারতের ভগবন্নির্দ্দিষ্ট শাশ্বত সাধনা। যত দিনে ইহা পূর্ণ না হয় ততদিন ভারতের মুক্তি নাই। ভারতের আত্মা যেন কায়ার পর কায়া ত্যাগ করিয়া ও গ্রহণ করিয়া তার সাধনার মুক্তি খুঁজিতেছে। এই সব ভাবের প্রবাহ (movements) নানা লোকের মধ্যে নানা ভাবে কত দূর দূরান্তরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, বারবার তাঁহাদের নাম উল্লেখ ব্যতীত তাহা বুঝাইবার উপায় নাই। ইহা সত্ত্বেও যে সব ভক্তের দেহান্তে তাঁহাদের অনুবর্ত্তী সম্প্রদায় বা সাধক-মণ্ডল গড়িয়া ওঠে নাই এই বক্তৃতায় তাঁহাদের নাম করা হয় নাই। তাই গভীর সাধক কমালও জ্ঞানদাসের মত বহু বহু ভক্তের নাম এখানে বাদ দিতে হইল। কারণ তাঁহারা কোন movement বা সাধনার মণ্ডলী রাখিয়া যান নাই। মধ্য-যুগের "লোক-বেদ-পন্থী" ও "অনুভৌসাচ-পন্থী" উভয়বিধ সাধকদের মধ্যে কেবল এমন সব লোকের নাম করা গেল যাঁহারা তাঁহাদের সাধনার ধারা ভক্তদের মধ্যে রাখিয়া গিয়াছেন।

---